প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি 2021

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau
of the University Grants Commission.

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)
Semester : I PGJMC
কোর কোর্স - 2
CC-2 (মিডিয়ার ইতিহাস)

মডিউল	কনটেন্ট রাইটার (Content Writer)	সম্পাদনা (Editor)
মডিউল ১	**শ্রীমতি সুস্মিতা পণ্ডিত,** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ফিউচার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট	**ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য** অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন) মানববিদ্যা অনুষদ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল ২	**শ্রী রাতুল দত্ত, সহ সম্পাদক** (গ্রুপ-এ), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ	
মডিউল ৩	**শ্রী সায়ন চট্টোপাধ্যায়,** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, বারুইপুর কলেজ	
মডিউল ৪	**ড: জয়তী কুমার মুখোপাধ্যায়,** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, গণজ্ঞাপন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	

PGJMC
স্নাতকোত্তর বিষয়ে সমিতি (PG Board of Studies)

অধ্যাপক শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়
প্রফেসর, গণজ্ঞাপন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান
ড: দেবজ্যোতি চন্দ
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,গণজ্ঞাপন ও ভিডিওগ্রাফি বিভাগ,
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
(সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন), মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মনন কুমার মণ্ডল
ডিরেক্টর,মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী স্নেহাশিস সুর
প্রবীণ সাংবাদিক, দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা
ড: পল্লব মুখোপাধ্যায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
শ্রী অরিজিৎ ঘোষ
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন),
মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

কোর কোর্স - ২ (মিডিয়ার ইতিহাস)

CC - 2

মডিউল - ১ : ভারতে প্রেসের ইতিহাস

একক - ১ ◻ টাইপসেটিং এবং মুদ্রণ প্রযুক্তির বিকাশ এবং তাদের প্রভাব-বিশেষ উল্লেখ ভারতের ক্ষেত্রে **7-13**

একক - ২ ◻ ভারতে প্রেসের প্রারম্ভিক ইতিহাস **14-23**

একক - ৩ ◻ ১৮৫৭ এর পরে ভারতীয় প্রেসের বিকাশ **24-30**

একক - ৪ ◻ স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীনতার পর থেকে প্রেসের ভূমিকা **31-41**

মডিউল - ২ : সংবাদ সংস্থা

একক - ১ ◻ সংবাদ সংস্থার বিকাশ **42-47**

একক - ২ ◻ ভারতে সংবাদ সংস্তার বিকাশ **48-52**

মডিউল - ৩ : স্বাধীনতার পরে প্রধান প্রবণতা

একক - ১ ◻ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে বেতার, টেলিভশন, স্যাটেলাইটে টিভি ও ইন্টারনেট-এর সম্প্রসারণ **53-62**

একক - ২ ◻ প্রেস কমিশন এবং প্রেস কাউন্সিল **63-71**

একক - ৩ ◻ ভারতীয় গণমাধ্যম ও বিশ্বায়ন **72-80**

একক - ৪ ◻ ভারতে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন শিক্ষার বিকাশ **81-89**

মডিউল -৪ : ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস

একক - ১ ◻ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ- প্রধান চলচ্চিত্র প্রযোজনা কেন্দ্র — বোম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা ইত্যাদি **90-99**

একক - ২ ◻ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের গুণীজন (স্বাধীনতা পরবর্তী) **100-113**

একক - ৩ ◻ ফিল্ম সেন্সরশিপ **114-120**

একক - ৪ ◻ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস **121-126**

মডিউল ১- ভারতে প্রেসের ইতিহাস

একক - ১ ◻ টাইপসেটিং এবং মুদ্রণ প্রযুক্তির বিকাশ এবং তাদের প্রভাব-বিশেষ উল্লেখ ভারতের ক্ষেত্রে

গঠন

১.১.১ উদ্দেশ্য

১.১.২ প্রস্তাবনা

১.১.৩ ভূমিকা

১.১.৪ সারাংশ

১.১.৫ অনুশীলনী

১.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১.১ উদ্দেশ্য

মুভেবল টাইপ (Movable type) থেকে প্রারম্ভিক মুদ্রণ এর সূচনা ষোড়শ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী সময়। এর আগে জ্ঞান সীমিত অবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল কয়েকজনের মধ্যে এবং লিখিত রেকর্ডগুলি ছিল কিছুজনের মূল্যবান সম্পত্তি। তবে মুদ্রণের উদ্বোধন ও বিকাশ ভারতীয় মাটিতে বইয়ের উৎপাদনের হার অনেকটা বাড়িয়েছে এবং আধুনিক যুগের সূচনা করেছে। আমরা এই একক এ ভারতীয় সমাজে মুদ্রণ প্রযুক্তির আবির্ভাব ও তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করবো।

১.১.২ প্রস্তাবনা

ভারতে খবর সরবারহ করার ইতিহাস মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। মুদ্রণ,বলতে বর্তমান সময়ে আমরা যা বুঝি তা ভারতে প্রাচীন যুগে যখন রাজা এবং সম্রাটদের শাসন করতেন তখন ছিল না। এটা এমন একটা যুগ যখন শিক্ষা ব্যবস্থা বিস্তৃত ছিল না এবং যোগাযোগ মাধ্যম ও পরিবহন ব্যবস্থা বেশ অপর্যাপ্ত ছিল। সম্রাট অশোক (৩০৪ বি.সি. থেকে ২৩৩ বি.সি.),তাঁর নিজেস্ব যোগাযোগ মাধ্যমের সূচনা করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে সমস্ত রাজকীয় নির্দেশ লিখিত ছিল তামার ফলক, শিলা এবং পাথরের স্তম্ভগুলিতে যা আজও বিদ্যমান উত্তর-পূর্বের আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণের কর্ণাটক রাজ্যে। তাঁর নির্দেশসমূহ অবহিত এবং শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে রাজকীয় রাজনৈতিক যোগাযোগের উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা শুরু হলো ভারতীয় প্রেস। যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে সংগঠিত হয়েছিল। এক রকমের লিখিত খবরের কাগজ প্রচারিত হয়। এটি অবশ্যই উল্লেখনীয় যে সংবাদ-লেখকদের উপস্থাপন ও প্রচারের সর্বাধিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। সাংবাদিকতার ইতিহাসবিদদের মতে,রাজা আকবার এর অধীনে সুসংগঠিতভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা শুরু হয়েছিল।

১.১.৩ ভূমিকা

এটি একটি সাধারণ বিশ্বাস যে মুদ্রিত বইগুলি প্রথমে তৈরী হয় চিনে এবং সবথেকে প্রাচীনতম মুদ্রিত বই যা কাঠের ব্লক থেকে উতাদিত হয় তার নাম ডায়মন্ড সুত্রা (Diamond Sutra) যা ৮৬৮ এডি তে প্রকাশিত হয়। তবে সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার এর ফলে এইটা কিছুটা প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতীয়রা প্রাচীন কাল থেকেই পুনরাবৃত্তির শিল্প ও ব্লক প্রিন্টিং এর শিল্পের সম্বন্ধে ধারণা ছিল এবং তারা চীনাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাঠের ব্লকার মাধ্যমে বৌদ্ধ রচনার প্রকাশনার দায়িত্ব নেন।

হরপ্পার মহেঞ্জোদারো এবং লোথাল থেকে পাওয়া অগুন্তি শীলের আবিষ্কার এই বিষয়টি নিশ্চিত করে যে প্রাক-ঐতিহাসিক দিন থেকে ভারতীয়দের মধ্যে মুদ্রণ শৈলীর মাধ্যমে পুনরাবৃত্তির ধারণাটা তৈরী হয়েছিল। 'মুদ্রা' শব্দটির অর্থ সীলমোহর হিসেবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সংস্কৃত নাটক মুদ্রা-রাখসা তে 'মুদ্রা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ব্লক থেকে মুদ্রণ করার পদ্ধতিটা বোঝাতে।

ভারতীয় পণ্ডিতরা চীনাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছিলেন চীনা সংস্করনের ত্রিপিটকের (Tripitaka) প্রকাশনার জন্য যা সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় ৯৭৩- ৮৩ এডি তে। ১,৩০,০০০ টি কাঠের ব্লক কাটা হয় এই প্রকাশনার জন্য এবং সেগুলিকে অন্য একটি বিভাগে সঞ্চিত রাখা হয় অনুবাদ এর দরবারের মাধ্যমে যেইখানে ভারতীয় সন্ন্যাসী এবং তাদের সহকর্মীরা নিয়মিত কাজ করে থাকেন।

ধর এর কামাল মাওলা মসজিদ থেকে পাওয়া পাথরের টুকরো ভারতে এগারো শতাব্দী তে প্রচলিত স্টোন ব্লক প্রিন্টিং এর দিকে আমাদের নজর টানে। মুদ্রণ রোল বই বা একক পাতা যা পাথরের ব্লক থেকে বানানো হতো চিনে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল।

অসংখ্য কাঠের কাজ এবং ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া ব্লক প্রিন্ট মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অঞ্চলটি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল যা প্রারম্ভিক ভাবে ভারতের মুদ্রণের উন্নয়ন এবং বিকাশের প্রতি অবদান এর দিকে আমাদের চোখ আকৃষ্ট করে।

প্রমাণ হিসাবে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে উপরে উল্লিখিত, যে অনুলিপি এবং ব্লক-প্রিন্টিং এর শিল্প প্রাচীন ভারতে পরিচিত ও চর্চিত ছিল। মধ্যযুগের সময় মোগল ও মারাঠাদের যোগাযোগ হয় ইউরোপীয়দের সাথে। ইউরোপীয় জেসুইটসরা মুদ্রিত বই নিয়ে এসে সেগুলিকে তৎকালীন শাসকদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে দৃঢ় যোগাযোগ এবং বই মুদ্রণ ও ছাপাখানা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়রাও এই শিল্প প্রবর্তন এর ধারণাকে উৎসাহ দেয়নি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অধ্যয়ন আমাদের আরও ভালোভাবে মুদ্রণ শিল্পের সূচনার বিরুদ্ধে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণগুলি কাজ করছে সেগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে। সাধারণত, এটি বলা হয় যে ধর্মীয় সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং ক্যালিগ্রাফি জন্য ভালবাসা থাকার পাশাপাশি লেখক এবং ক্যালিগ্রাফারের খ্যাতি এবং জীবিকায় যাতে হ্রাস না পরে সেই জন্য ষোড়শ শতাব্দীর আগে ভারতে মুদ্রণ শিল্প তেমন বিকাশ লাভ করতে পারেনি।

ভারতীয় মাটিতে মূলত মুদ্রণের বিকাশ দেশের উপকূলের রেখাগুলির অনুসারে হয়েছে। পশ্চিম উপকূলে গোয়া, কিউইলন, আম্বালাক্কাদুল ও ট্র্যাংকবার এর পাশাপাশি বোম্বাই এবং পুনা আবার পূর্ব উপকূলে ভ্যাপেরি, ফোর্ট সেইন্ট জর্জ, মাদ্রাজের পাশাপাশি ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতা ও শ্রীরামপুরে হয়েছিল।

গোয়া

প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি পর্তুগাল থেকে গোয়ায় পৌঁছেছিল ৬ ই সেপ্টেম্বর ১৫৫৬ এ। ফাদার বেক্কারির দ্বারা সম্পাদিত ১০ নম্বর খন্ডে প্রকাশিত একটি চিঠি যেইটা ফাদার গ্যাস্পার কালাজে সেইন্ট ইগনাটিউস কে ৩০শে এপ্রিল ১৫৫৬ সালে লিখেছিলেন সেখানে এইটা পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে একটি মুদ্রণযন্ত্র পর্তুগাল থেকে আবিসিনিয়া তে ফাদার জন নুনেস এর তত্ত্বাবধান এ আবিসিনিয়ার সম্রাটদের ইচ্ছাতে পাঠানো হয়েছিল। ফাদার এর সঙ্গে জুয়ান দে বুস্তামন্তে ছিলেন যিনি মুদ্রণ শিল্পটি জানতেন এবং তার সঙ্গে একজন ভারতও ছিলেন যিনি বুস্তামন্তে মুদ্রণ যন্ত্রটি চালু করার কাজে সাহায্য করেছিলেন।

যেই জাহাজটি তাদের কে অ্যাবিসিনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছিলো সেইটা গোয়ায় পৌঁছলে, গোয়ার গভর্নর জন নুনেসকে সেখানে কিছুদিনের জন্য থাকার অনুরোধ জানালেন। তার অনুরোধ ফেলতে না পেরে নুনেস গোয়ায় থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। মুদ্রণযন্ত্রটি ১৫৫৬ সালের অক্টোবর থেকে কার্যকরী হলো যখন জন যুক্তি এবং দর্শন এর কিছু থিসিস এর পাতা ছাপানো কাজে হাত দিলেন যা আসলে লোকসমক্ষে হওয়া আলোচনার সারাংশ ছিল।

১৫৫৭ সালে পর্তুগিজ ভাষায় প্রথম জানা বই সেন্ট জ্যাভির্সের 'ডাউট্রিন্স' ক্রিস্টা" (Doutrins Christa) গোয়াতে ছাপা হয়েছিল। দুঃখজনক ভাবে এই শিরোনামের কোনও অনুলিপি এখন উপলব্ধ নেই। তবে তামিল ভাষায় অনুবাদ করা 'ডাউট্রিনা ক্রিস্টা' যা ১৫৫৪ সালে লিসবনে মুদ্রিত হয়েছিল সম্প্রতি লিসবনের মিউজু এটনোলজিস দা বেলেমে পাওয়া গেছে।

জন কুইনকেনসিও (John Quinquencio) এবং জন অফ এন্ডেম (John of Endem), যারা মুদ্রাকর হিসেবে পর্তুগাল থেকে গোয়ায় আর্কবিশপ এর সঙ্গে এসেছিলেন তারা গ্যাস্পার ডি লিওর (Gaspar de Leao)এর লেখা 'কমপেন্ডিও আধ্যাত্মিক ডি ভিডিও ক্রিস্টাও' (Compendio Spiritual de vide Christao) ২রা জুলাই, ১৫৬১ সালে ছাপিয়েছিলেন। এর একটি অনুলিপি নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

১৫৭৮ সালে ডাউট্রিনা ক্রিস্টার একটি তামিল অনুবাদ হেরিক হেনরিক্স দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। মালবার তামিল অক্ষরে ছাপানো ফাদার সৌজা (Father Souza) লিখেছেন যে 'এটিই প্রথম মুদ্রিত বই যা ভারতের জমিতে জন্মগ্রহণ করেছিল'। যদিও সেন্ট জেভিয়ার্সের ডাউট্রিনা ক্রিস্টা ১৫৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই জন্য ফাদার সৌজা 'প্রথম মুদ্রিত বই' বলতে ভারতীয় ভাষায় প্রথম মুদ্রিত বই যা তামিল ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল।

১৫৭৭ থেকে ১৫৭৪ এর মধ্যে একজন স্প্যানিশ ভদ্রলোক জোয়াও গনসালভেস এবং রেভারেন্ড জোয়াও দা ফারিয়া দুজনে মিলে ইন্ডিক টাইপগুলি প্রস্তুত করেন। জোয়াও গনসালেস ভারতে প্রথম মালাবার টাইপ অক্ষর তৈরী করেন যা দিয়ে প্রথম বই ছাপা হয়। পেরো লুইস নামে একজনকে গোয়ায় পাঠানো হয়েছিল জোয়াও গনসালেসকে ভারতীয় বর্ণমালার ব্যবস্থা সম্পর্কে বোঝাতে।

ডাউট্রিনা ক্রিস্টা মালাবার এবং তামিল টাইপ এ ছাপা হয়। বইটির প্রথম আটটি লাইন গনসালভেস গোয়া তে তৈরী করেছিলেন ১৫৭৭ সালে আর বই এর বাদবাকি অংশগুলি ১৫৭৮ সালে কুইলন এ ফারিয়ার দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। এই বিশেষ খণ্ডটির শুধু ১৬ টি পৃষ্ঠা আছে যা এইমুহূর্তে হার্ভার্ড কলেজ এর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

আম্বালকাকাদু

কোচিনের আম্বালকাকাদু ও সেই সময় আদি ভারতীয় মুদ্রনের কেন্দ্র ছিল তবে এই জায়গায় কোনও মুদ্রিত বই পাওয়া যায় না। ডাউট্রিনা ক্রিস্টার একটি আলাদা খন্ড যা কোচিনে ছাপা হয়েছিল ১৫৭৯ সালে সেটি ১৫৭৮ সালে ছাপা ডাউট্রিনা ক্রিস্টা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ নয় বরংচ একটি স্বাধীন কাজ যা মার্কোস জর্জের একটি পর্তুগিজ ভাষার কাজের ১২০ পৃষ্ঠার একটি বিস্তৃত অনুবাদ যা ১৫৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি সোরবোনের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত করা আছে। ফ্লোস সানেটরম নামক আরেকটি এইচ হেনরিক্সে দ্বারা লেখা তামিল বই ১৫৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি এখন ভ্যাটিকান লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত।

১৬৭৪ সাল অবধি গোয়ায় সক্রিয়ভাবে মুদ্রণ অব্যাহত ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে এটি কমে যায় যেহুতু মিশনারীরা ভারতীয় ভাষা শেখার প্রতি একটি উদাসীন মনোভাব দেখায়। ১৬৮৪ সালের একটি ফরমান অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে পর্তুগিজ ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় এবং বাকি স্থানীয় ভাষা আস্তে আস্তে তাদের গুরুত্ব হারায় যার ফলে ভারতীয় মুদ্রণের বৃদ্ধি এবং বিকাশ কিছুটা আঘাত পায়।

ক্যাথলিক মিশনারিদের মতো ডেনিশ প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরাও ভারতে মুদ্রণ প্রবর্তনের কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ডেনিশ প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য স্থানীয় লোকেদের ভাষা শেখেন তাদের সামাজিক প্রথা এবং ধর্মের সাথে পরিচিত হন এবং মুদ্রণ চালু করার চেষ্টা করেন। বাথর্লোলেমেও জিগেনবালগ ১৭০৬ সালে ভারতে পৌঁছলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার করার জন্য খ্রীষ্টান সাহিত্যগুলিকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন। জিগেনবালগ ২২শে আগস্ট ১৭০৮ সালে মালাবার ও পর্তুগিজ প্রেস তৈরি করার দাবি করেন এবং ১৭০৯ সালে সমস্ত প্রটেস্টান্ট ইউরোপিয়ান দেশগুলি কে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার প্রার্থনা করেন। জিগেনবালগ ও এফ ই গ্রউন্ডলার বারংবার একটি মুদ্রণ প্রেস এর দাবি করতে থাকলেন। এ ডব্লিউ বেহমে নামে ডেন্মার্কএর রাজা জর্জ এর জার্মান যাজক তাদের মুদ্রণ যন্ত্রের দাবি তে সফলতা লাভ করলেন যখন সোসাইটি ফর প্রমোশন অফ খ্রীষ্টান নলেজ ইংল্যান্ড থেকে একটি মুদ্রণ যন্ত্র, ১০০ রীম কাগজ আর ,২১৩ টি পর্তুগিজ ভাষায় নিউ টেস্টামেন্ট ও একজন জোন্স ফিংক নামক মুদ্রাকরকে ভারতে পাঠালেন।

ট্র্যাংকবার

মুদ্রাকর বাদে এই সমস্ত জিনিস পরের বছর ভারতে আসে। ফিঙ্ক, ভারতে যাওয়ার পথে কেপ অফ গুড হোপের কাছে জ্বরের কারণে মারা যান। মুদ্রণ যন্ত্রটি ট্র্যাংকবারে (মাদ্রাজ) ১১ জুন ১৭১৩ সাল থেকে কাজ শুরু করে দেয় একজন জার্মান প্রিন্টারের সহায়তায় যিনি তখন একটি ডেনিশ সংস্থার সাথে কাজ করতেন। তারা জোরেশোরে মালাবর টাইপ তৈরি করতে শুরু করেন এবং তারা খুব তাড়াতাড়ি একটি ফাউন্ড্রি প্রতিষ্ঠা করেন। ১১ ই ডিসেম্বর , ১৭১৩ সালে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে সেই ছয় মাসের মধ্যে প্রেস এবং ফাউন্ড্রি ভাল অগ্রগতি করেছিল। তারা 'দি এবোমিনেশন অফ পেগানিজম এন্ড দি ওয়ে ফর দি পেগানস টু বি সেভড' ছেপেছিলেন প্রথমবারের তৈরি টাইপ দিয়ে যা পরীক্ষামূলক ভাবে তৈরী করা হয়েছিল। ১৭১৪ সালে তামিল ভাষায় দি নিউ টেস্টামেন্ট ও দি ফোর এভাঞ্জেলিস্টস এন্ড এক্টস অফ দি অপোস্টলস ছাপা হয়েছিল। শ্রীরামপুর কলেজ এর গ্রন্থাগার এ সেটি এখন সংরক্ষিত আছে। ভারতে তারা মিশন এর স্বার্থে একটি পেপার মিল তৈরী করার চেষ্টা করেন।

খ্রিস্টান ফ্রেডরিক শোয়ার্জ নামক একজন ডেনিশ মিশনারি যিনি তাঞ্জোরের রাজা সার্ফজি ভেঁ সলের শিক্ষক ছিলেন, তিনি তাকে প্রভাবিত করেন সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষায় বই ছাপার জন্য একটি মুদ্রণ প্রেস খোলার জন্য। মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষায় যেই বইগুলি এই মুদ্রনালয় থেকে উন্নিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছাপা হয়েছিল সেইগুলি হলো যেকানাথের যুদ্ধ কাণ্ড (১৮০৯), মাঘার শিশুপাল বধ (১৮১২), তাছাড়া কারিকাভালি ও মুক্তভালি। এই প্রেস এ যেই দেবনাগরী টাইপ ব্যবহার করা হয়েছিল সেইগুলি চার্লস উইলকিন্স নামক একজন ভদ্রলোক কাস্ট করেছিলেন।

মাদ্রাস

মাদ্রাসের প্রথম মুদ্রণালয় ভাপেইরি তে শুরু হয় যার নাম পরবর্তীকালে ডাইসেশন প্রেস নামে প্রসিদ্ধি পায়। মাদ্রাসে তামিল ভাষার টাইপগুলি কাস্ট করা হয় এবং ভাপেইরি তে ব্যবহার করা হয় ১৮৭০ সাল অব্দি। ভ্যাপেরইর মুদ্রণালয় তৈরী করার পেছনে একটা গল্প আছে। বলা হয় যে ১৭৬১ সালে যখন স্যার আয়রে কুটি ফ্রেঞ্চদের কাছ থেকে পন্ডিচেরীর আধিপত্য নেন সেই সময় গভর্নর এর বাড়িতে উনি একটি মুদ্রণ প্রেস ও কিছু টাইপ পান। এইগুলিকে উনি মাদ্রাজে নিয়ে আসেন কিন্তু ফোর্ট সন্ত জর্জ এর আধিকারিকরা সেইটা কে মুদ্রাকর না থাকার কারণে ব্যবহার করতে পারেননি। তামিল পন্ডিত ফ্যাব্রিকস সেই সময় ভ্যাপেরইতে থাকতেন এবং তাকে এই মুদ্রণযন্ত্রটির দায়িত্ব দেওয়া হলো এই শর্তে যে তিনি প্রয়োজনে কোম্পানির মুদ্রণের কাজ করবেন। ভ্যাপেরইতে থাকাকালীন ফ্যাব্রিকস তার একটি স্তবগানের বই ও তামিল ইংরেজি অভিধান ছাপান। মাদ্রাসের ফোর্ট সেইন্ট জর্জ কলেজ ১৮১২ সালে স্থাপিত হয় এবং এই কলেজের প্রেস তেলুগু ও কন্নড ভাষায় ছাপানো হয়। এই কলেজটি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এর নমুনায় তৈরী করা হয়েছিল।

বম্বে

বম্বেতে প্রথম মুদ্রণ চালু করার চেষ্টা ১৬৭৪-৭৫ সাল নাগাদ হয়। ভীমজি পারেখ নামক একজন গুজরাটি বণিক এর প্রবর্তক ছিলেন। উনি হিন্দু ধর্মের গ্রন্থগুলিকে ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিলেন যেহেতু এই গ্রন্থগুলির চাহিদা বাজারে সেই সময় ছিল। সে অনুযায়ী তিনি একটি প্রেস আমদানি করেছিলেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অনুরোধ করেছিলেন বম্বেতে একটি সক্ষম প্রিন্টার কে পাঠানোর যার জন্য তিনি তাকে বছরে ৫০ পাউন্ড স্টার্লিং করে তিন বছর দেওয়ার জন্য রাজি ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভীমজির ইচ্ছেগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এই ভেবে যে এই পদ্ধতিতে তারা খ্রীষ্টান সাহিত্য ছাপাতে সক্ষম হবেন যা খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে।তেসরা এপ্রিল, ১৬৭৪ সালের একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে হেনরি হিলস নামক একজন মুদ্রাকরকে প্রেস, টাইপ ও অন্যান্য জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে বম্বেতে পাঠানো হয়। জেনারেল আউংগেয়ার যিনি বম্বের গভর্নর ছিলেন তিনি মুদ্রণ শিল্প কে আরো বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং রাজ্যের কিছু কাগজ ছাপা শুরু করেছিলেন।

বম্বে টাইমস এর সম্পাদক, জর্জ বুইস্ট, বলেছেন যে ক্যালেন্ডার ফর দি ইয়ার অফ আওয়ার ল্যান্ড ১৭৮০ বম্বের প্রথম মুদ্রিত বই। বইটির ৩৪ ঠা পৃষ্ঠা নিয়ে মুদ্রিত হয়েছিল। দি কুরিয়ার প্রেস বম্বের একটি প্রধান মুদ্রণালয় ছিল এবং তার মালিক তাদের ব্যবসার স্বার্থে গুজরাটি ও মারাঠি টাইপ এ ছাপার সিদ্ধান্ত নেন। মারাঠি ভাষায় প্রথম বিজ্ঞাপন ১৮০২ সালে বম্বে কুরিয়ার নামক উক্তি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়।

টাইপোগ্রাফিকাল এর পাশাপাশি লিথোগ্রাফিক্যাল প্রিন্টিং বম্বের নেটিভ এডুকেশন সোসাইটির প্রেসে করা হতো, কিন্তু টাইপের আকার বড় হওয়ার কারণে অনেক কাগজের প্রয়োজন ছিল যার বেশি টাকা খরচ হতো। সেই জন্য কলকাতা থেকে ছোট ধরণের টাইপ আনানো হয়। লিথোগ্রাফিক মুদ্রণের জন্য কালি এবং পাথর ছিল প্রয়োজনীয়

উপাদান। কালি ও লিথোগ্রাফিক পাথর ভারতে উতাদিত হওয়া শুরু হয় ১৮২৬ সাল থেকে এবংতখন থেকে তারা ইংল্যান্ড থেকে আনা পাথরকে প্রতিস্থাপন করে।

বেঙ্গল

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সাল থেকে বাংলার প্রশাসন পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে যার ফলের তাদের সরকারী কর্মচারীরা এই স্থানান্তর এই প্রদেশের ভাষা শেখা শুরু করেন। এই ভাষা শেখার উদ্যোগ বাংলা ভাষায় মুদ্রণের উন্নতি ও ক্রমবিকাশে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৭৭৮ সালে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড নামক একজন কর্মচারী, যিনি বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন উনি ইংরেজি ভাষায় - এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে নামক একটি পুস্তক সংকলিত এবং মুদ্রিত করলেন। এই খণ্ডটি সেইন্ট আন্দ্রেউস প্রেস, হুগলিতে ছাপা হয়েছিল এবং লিসবন এবং লন্ডনের প্রকাশনা বাদ দিলে এটি হলো প্রথম দিকের বাংলা মুদ্রণের গোড়ার দিকের নমুনা। চার্লস উইলকিনস নামক একজন এই বইটিতে টাইপগুলিকে কাস্ট করেছিলেন।

চার্লস উইলকিনস বেঙ্গলে ১৭৭০ সালে আসেন এবং সংস্কৃত ও বাংলা সহ অন্যান্য পূর্বদেশীও ভাষা শেখেন। উইলকিনস ইংরিজি ভাষায় গীতা, হিতোপদেশ ও শকুন্তলার অনুবাদ করেন। উইলকিনস কিছু ভারতীয় কারিগরদের প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন যা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করেছিল। তিনি শ্রীরামপুরের শ্রী পঞ্চানন কর্মকারকে নিযুক্ত করেছেন তার সহকারী হিসাবে। পঞ্চানন টাইপ কাটার শিল্প শিখলেন তার কাছ থেকে এবং বাংলা টাইপ কাস্ট করলেন কলকাতা ও শ্রীরামপুরে অবস্থিত প্রেসের জন্য। ১৭৮৩ সালে যখন উইলিয়াম জোন্স যখন বাংলায় আসেন সুপ্রিম কোর্ট এর জজ হিসেবে তখন উইলকিন্স তার সাহায্যে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এর স্থাপন করেন।

১৭৮০ সালে জেমস অগাস্টাস হিকি কলকাতায় প্রথম মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন তার সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট ছাপানোর জন্য। ১৭৮৪ সালে ফ্রান্সিস গ্লদিন ক্যালকাটা গেজেট প্রেস এর স্থাপনা করেন যেখান থেকে সমস্ত সরকারি কাগজ ছাপানো হয়। বাংলার ইতিহাসে ১৭৯৯ এবং ১৮০১ সাল মুদ্রণের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় মিশনারিদের একটি গোষ্ঠী গঙ্গার তীরে অবতরণ করেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন স্বদেশীয় ভাষা তরুণ সিভিলিয়ানদের শেখানোর জন্য।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যাপটিস্ট মিশনকে নিজেদের অঞ্চলে তাদের কেন্দ্র খোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় তারা কলকাতার কাছে ডেনিশ অঞ্চল, শ্রীরামপুরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাইবেল এবং অন্যান্য খ্রিস্টান সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ করা।

ডাঃ, জন থমাস, যিনি ১৭৮৩ সালে বাংলায় এসেছিলেন তিনি শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি ১৭৯২-তার দেশে ফিরে যান এবং পরের বছর উইলিয়াম কেরিকে নিয়ে আসেন। কেরির মূল উদ্দেশ্য খ্রীষ্টান সাহিত্যগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীরামপুর ১৮৬০ শাল অব্দি একটি গুর্ত্বপূর্ণ পূর্বদেশীয় ফাউন্ডরী হিসেবে কাজ করেছে এবং ১৮০০ থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুর প্রেস দুশো থেকে বারোহাজার খন্ড চল্লিশটি ভাষায় ছাপিয়েছে। তাছাড়াও তারা চীনা ভাষায় মুভেবল মেটাল টাইপ অক্ষর তৈরী করেছেন।

১.১.৪ সারাংশ

ভারতীয় পণ্ডিতরা চীনাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছিলেন চীনা সংস্করনের ত্রিপিটকের (Tripitaka) প্রকাশনার জন্য যা সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় ৯৭৩- ৮৩ এডি তে। ত্রিপিটক প্রকাশনার ক্ষেত্রে কাঠের ব্লক ব্যবহার

করা হয়। ভারতে এগারো শতাব্দীতে যে স্টোন ব্লক প্রিন্টিং এর ও চল ছিল সেইটাও আমরা কামাল মাওলা মসজিদ থেকে পাওয়া পাথরের টুকরোর মাধ্যমে জানতে পারি। ভারতীয় মাটিতে মূলত মুদ্রণের বিকাশ দেশের উপকূলের রেখাগুলির অনুসারে হয়েছে। পশ্চিম উপকূলে গোয়া, কিউইলন, আম্বালাক্কাদুল ও ট্র্যাংকবার এর পাশাপাশি বোম্বাই এবং পূনা আবার পূর্ব উপকূলে ভ্যাপেরি, ফোর্ট সেইন্ট জর্জ, মাদ্রাজের পাশাপাশি ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতা ও শ্রীরামপুরে হয়েছিল। প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি পর্তুগাল থেকে গোয়ায় পৌঁছেছিল। মুদ্রণযন্ত্রটি ১৫৫৬ সালের অক্টোবর থেকে কার্যকরী হলো। ভারতীয় মুদ্রণ ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনারি ও ড্যানিশ মিশনারিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১.১.৫ অনুশীলনী

১. প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি ভারতবর্ষে কোন দেশ থেকে এসেছিলো ?

২. পর্তুগিজ ভাষায় প্রথম কোন বইটি গোয়া থেকে ছাপা হয়েছিল ?

৩. গোয়াতে মুদ্রণ ব্যবস্থার পতন এর পিছনে কারণগুলি কি কি ?

৪. প্রথম বাংলা ভাষার মুদ্রণালয় এর স্থাপনা কে করেছিলেন ?

৫. বাংলায় শ্রীরামপুর মিশনারি স্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কে নিয়েছিল ?

১.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

- মার্গারিটা, বি. (১৯৪০). দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস: এ হিস্ট্রি অফ দ্য গ্রোথ অফ পাবলিক ওপিনিয়ন ইন ইন্ডিয়া. জি অ্যালেন এন্ড এডউইন.
- চালাপথী রাও, এম. (১৯৭৪). দ্য প্রেস. ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট.
- চক্রবর্তী, এস. (১৯৭৬). দ্য বেঙ্গল প্রেস, ১৮১৮-১৮৬৮: স্টাডি ইন দ্য গ্রোথ অফ পাবলিক ওপিনিয়ন.
- কাকবা প্রিয়লকার, এ. (১৯৫৮). প্রিন্টিং প্রেস ইন ইন্ডিয়া: ইটস বেগিননিংস এন্ড আর্লি ডেভেলপমেন্ট. বম্বে ইউনিভার্সিটি প্রেস.

মডিউল ১ ভারতে প্রেসের ইতিহাস

একক : ২ ◻ ভারতে প্রেসের প্রারম্ভিক ইতিহাস

১.২.০ গঠন

১.২.১ উদ্দেশ্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

১.২.৩ মোগল সাম্রাজ্যের সময়কার নিউজলেটার

১.২.৪ হিকির বেঙ্গল গেজেট

১.২.৫ ভারতীয় প্রেসের উপর বিধিনিষেধ

১.২.৬ ১৯ শতকের ভারতীয় প্রেস

১.২.৭ জেমস সিল্ক বাকিংহাম ও রাজা রাম মোহন রায়

১.২.৮ স্যার চার্লস মেটকাফ (Sir Charles Metcalfe)

১.২.৯ উপসংহার:

১.২.১০ সারাংশ

১.২.১১ অনুশীলনী

১.২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১.২.১ উদ্দেশ্য

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বিবর্তন উন্নয়নমূলক অসুবিধা, নিরক্ষরতা, ঔপনিবেশিক বাধা এবং দমন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এটি স্বাধীনতার ধারণাগুলি প্রচার করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়। এই এককে আমরা ভারতে মুদ্রণ প্রেস এর আবির্ভাব, ভারতীয় সংবাদপত্রের এর উদ্ভব এবং তার উপর ব্রিটিশ শাসনের লাগানো নানা বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা করবো। এই আলোচনা ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় সংবাদপত্রের বিবর্তন এর প্রতি একটা প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি করবে।

১.২.২ প্রস্তাবনা

যেকোন দেশে প্রেসের ক্রমবিকাশ মূলত সেই দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী হয় এবং সেইজন্য প্রেসের বিকাশ এবং প্রভাব, বুঝতে গেলে আমাদের প্রয়োজন সেদেশে প্রচলিত পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করা। সেইভাবে দেখতে গেলে, ভারতের প্রেসের ইতিহাস ভারতে ব্রিটিশশাসনের একীকরণও বর্ধনের ইতিহাস। মানুষের মন সবসময় কৌতূহলের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত থাকে যার ফলে জ্ঞানের প্রতি একটা ক্ষুধা

তৈরি হয়। প্রথমথেকেই মানুষের জিজ্ঞাসু মনোভাব তাকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট করে যার ফলে সে সেই ঘটনাগুলি জানার বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করতে থাকে।

১.২.৩ মোগল সাম্রাজ্যের সময়কার নিউজলেটার

ভারত বিজয়ের পরে মুসলিম শাসকরা এমিসরিজ (emissories) এর প্রাচীন পদ্ধতিকে প্রশাসনের এর কাজে একটু উন্নতির সঙ্গে ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন।তারা এটিকে একটি সংস্থার রূপ দিয়েছিলেন। রাজ্য নিয়মিত ভাবে আদালতকে বিভিন্ন ঘটনা, অনুষ্ঠান এবং অভিযোগ এর বিষয়ে অবগত রাখার জন্য পৃথক বিভাগ চালু রেখেছিল।এই পৃথক বিভাগগুলো সমস্ত ঘটনা, অনুষ্ঠান এবং অভিযোগ এর বিবরণ সম্পর্কে ওয়াকিয়া অর্থাৎ সংবাদবাহী পত্র হিসেবে একজন ওয়াকিয়া নবিস এর অধীনে রাখা হতো। আধুনিক ভারতীয় সাংবাদিকতার উৎসটি আওরঙ্গজেবের শাসনকালের সঙ্গে জড়িত।

পত্রিকাগুলি আওরঙ্গজেবের সময়ে অনেকটা স্বাধীনতা উপভোগ করেছিল যা স্পষ্টতই পত্রিকায় ছাপা তাঁর এবং তাঁর নাতি আজিম ও শান এর সম্পর্কের বিষয়ে মন্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ১৮২৪ সালে কর্নেল জেমস টড রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি লন্ডনে মোগলে আদালতের (১৬৬০) শতাধিক মূল পাণ্ডুলিপি সংবাদপত্র পেয়েছিলেন। এই কাগজগুলি আকারে আট ইঞ্চি বাই চার এবং অর্ধ ইঞ্চি ও বিভিন্ন হাতে লেখা। তারা বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয় যেমন প্রচার, সম্রাটদের দ্বারা মসজিদ পরিদর্শন, শিকার অভিযান, উপহার এবং উপহার ইত্যাদি।

মোগল শক্তির ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদেশগুলির মধ্যে ঘন ঘন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। নবাবের মৃত্যু অনিবার্যভাবে প্রতিপক্ষ দাবিদারদের মধ্যে সিংহাসনে উত্তরাধিকারের চাহিদা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের পরিষেবাগুলি বিক্রয় করার জন্য এই সুযোগগুলি বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগায়। প্রথমত তাদের পরিষেবাগুলি তারা ব্যবহার করে মুনাফার পরিবর্তে যুদ্ধরত গোষ্ঠীগুলিকে বিক্রি করার জন্য এবং পরে শুরু হয় তাদের নিজের স্বার্থ পূরণ করার জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ, ভারতের ভাগ্যকে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেয়। যদিও এই যুদ্ধের আগে মুদ্রণ প্রেস ভাস্কো দা গামা ধর্মীয় বই মুদ্রণের জন্য ভারতে ১৫৫৭ সালে নিয়ে এসেছিলেন। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বোম্বেতে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ১৬৭৪ সালে এবং প্রথম অফিসিয়াল প্রিন্টিং প্রেস কলকাতায় স্থাপন করা হয়েছিল ১৭৭৯ সালে। কোম্পানির প্রশাসন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল যাতে এই প্রেসগুলি কোনও ভাবে তাদের কোনো কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত না হয়। এই ব্যাপারটাকে বজায় রাখার জন্য যে কোনো নতুন সংবাদপত্র চালু করার ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলাদের তীব্র বাধা ছিল।

১৭৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস বিজ্ঞপ্তি দেন যে মুদ্রণ প্রেস না থাকলে মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই অসুবিধাজনক। যে কোনো ব্যক্তি যার মুদ্রণের ব্যবসা সম্পর্কে দক্ষতা আছে বা যে একটি প্রেস পরিচালনা করতে পারে তাদেরকে বোল্টস বিশেষ উৎসাহ দেবেন। তিনি মানুষজনকে অনুরোধ জানান যে যার কাছে পাণ্ডুলিপি রূপে যোগাযোগ করার জিনিস আছে, যা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত বা যা কোনো ব্যক্তির মধ্যে কৌতুহল যোগায় তাদেরকে বোলৎসের বাড়িতে পড়ার ও অনুলিপি নেওয়ার অনুমিতি দেয়া হবে।

বোলৎসের বিজ্ঞপ্তিটি বজ্রের মতো এসেছিল; এটি প্রশাসকদেরকে আতঙ্কিত করেছিল। তাকে নির্বাসন এর নোটিশ পেশ করা হয়েছিল।কোম্পানির মতে তিনি প্রশাসন এর মধ্যে বিরোধিতা ও অসন্তোষ আনার চেষ্টা করেছেন যা তাকে কোম্পানির সুরক্ষা ও কোম্পানির কোনো কাজকর্মের ক্ষেত্রে অযোগ্য প্রমাণ করে।

১.২.৪ হিকির বেঙ্গল গেজেট

পরবর্তী বারো বছর সংবাদপত্র প্রকাশের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অবশেষে ২৯শে জানুয়ারি, ১৭৮০ সালে প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র জেমস অগাস্টাস হিকির বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইসার শিরোনামে প্রকাশ করেছিলেন। হিকি পেশাগত দিক থেকে প্রিন্টার ছিলেন এবং তার সংবাদপত্রের উদ্যোগ সম্বন্ধে উনি বলেছেন - 'আমার কোনও বিশেষ আগ্রহ নেই পত্রিকা মুদ্রণে; আমাকে দাসত্ব করার মতো কঠোর পরিশ্রমের জীবনের উদ্দেশে পুষ্ট করা হয়নি, তবুও আমি আমার দেহকে দাস বানিয়ে আনন্দিত কারণ এর ফলে আমি আমার মন এবং আত্মার স্বাধীনতা কিনতে পারি।'

হিকির 'বেঙ্গল গেজেট বা কলকাতা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার ছিল একটি দুটি পাতার সাপ্তাহিক রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কাগজ সমস্ত পক্ষের জন্য উন্মুক্ত তবে কারুর দ্বারা প্রভাবিত নয়। '

যারা ক্ষমতায় ছিলেন, হিকি তাদের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এমনকি গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস এবং তাঁর স্ত্রীকেও। এই নীতি শীঘ্রই তাকে সমস্যায় ফেলেছিল এবং ১৭৮০ সালের নভেম্বরে তাঁর পত্রিকাটি জেনারেল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তারপরেও হিকি তাঁর পত্রিকার প্রচার চালিয়ে যান, কলকাতার পিয়নদের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সরবরাহ করে। তবে ওয়ারেন হেস্টিংস হিকিকে ও হিকির কাগজ কে ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয়ে পড়েন।

হিকিকে একটা কেসে দু বছরের কারাদণ্ড এবং দু হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং আরেকটা কেসে হেস্টিংস-এর মানহানির জন্য পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অনন্য দুটো বিচারের ক্ষেত্রে তাকে ৮০০০০ টাকা জামিনের জন্য দিতে বলা হয়। এ জাতীয় ভারী জামিনের দাবির প্রতিবাদে হিকি ক্রাউন এর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠি বেঙ্গল গেজেটে, ১৭৮১ সালের জুন মাসের ১৬-২৩ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল তবে তার প্রার্থনা মনজুর হয়নি। তিনি জামিনের ৮০০০০ টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যার ফলে , তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। তবে তিনি কারাগার থেকে কাগজ সম্পাদনা করতে থাকলেন। অন্যদিকে সমানভাবে অদম্য, ওয়ারেন হাস্টিংস মামলার পর মামলা দায়ের করেছেন হিকিকে হয়রান করার জন্য। অবশেষে তার বন্ধু, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, স্যার এলিজা ইম্পের সহায়তায় তিনি শেষ পর্যন্ত হিকির ছাপাখানা কে বিক্রি করতে সফল হন যেহেতু হিকি জরিমানার টাকা দিতে ব্যর্থ হন।

এই সময়ের মধ্যে, ওয়ারেন হেস্টিংস অন্য প্রকাশকদের উতাহিত করেছিলেন। যেমন বি. মেসিঙ্ক এবং পিটার রিড, যারা সেই বছরেই (১৭৮০) 'ইন্ডিয়া গেজেট' নামক একটি সংবাদপত্র শুরু করেছিলেন। তারা কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তারা তাদের দ্বারা জারি করা নির্দেশাবলী এবং আইন মেনে চলবেন। চার বছর পরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'কলকাতা গেজেট' নামক সংবাদপত্র চালু করেন। 'মাদ্রাজ কুরিয়ার' মাদ্রাজে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ছিল যা ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং বোম্বেতে 'বোম্বে হেরাল্ড' নামের পত্রিকা ১৭৯১ সালে ও এ'বোম্বে গেজেট' নামের আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

এই জার্ণালগুলোর সম্পাদকেরা যদিও নিয়ম মেনে চলার সম্মতি দেন তবুও প্রায়শই এই সব পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করা হয়। যার ফলে কতৃপক্ষের ক্রোধের মুখোমুখি তাদের হতে হয়। এর ফলস্বরূপ বোম্বে গেজেট ভারী লোকসানের মুখোমুখি হয় আর তার সম্পাদক

মিঃ ফার কে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তার উত্তরসূরি সহজেই প্রকাশের আগে সচিবের কাছে পরিদর্শনের জন্য প্রুফ শিট জমা দিতে রাজি হন। পরে, কাগজটি সরকারী কাগজ হিসেবে পরিণত হয় যেহেতু ভারী ক্ষতির ফলে কাগজটি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা চেয়েছিল।

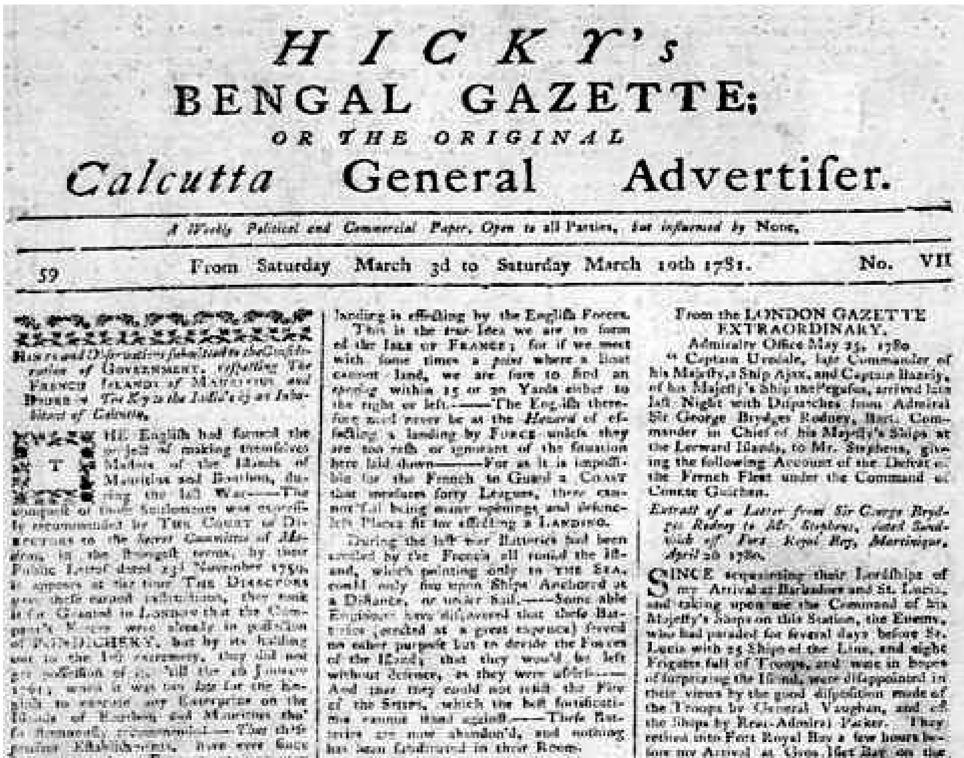

HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertiser.

A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties, but influenced by None.

59 From Saturday March 3d to Saturday March 10th 1781. No. VII

From the LONDON GAZETTE EXTRAORDINARY.
Admiralty Office May 25, 1780.

Extract of a Letter from Sir George Brydges Rodney to Mr. Stephens, dated Sandwich off Fort Royal Bay, Martinique, April 26 1780.

ছবি সৌজন্যে-Archive of University of Heidelberg

১.২.৫ ভারতীয় প্রেসের উপর বিধিনিষেধ

১৭৮৬ সালে, লর্ড কর্নওয়ালিসকে গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে একদিকে একীকরণ এবং অন্যদিকে প্রশাসনের সংস্কার করার দায়ভার দেওয়া হয়। তবে বাংলার ব্যাপারটা আলাদা ছিল। এখানকার সম্পাদকরা জোর গলায় আমলাতান্ত্রিক নিয়মের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। ১৭৯১ সালে, বেঙ্গল জার্নাল এর সম্পাদক উইলিয়াম ডুয়ানে তার জার্ণালে লর্ড কর্নওয়ালিসের মৃত্যুর একটি ভুয়ো সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এরপরে, তিনি সম্পাদক হিসাবে চালিয়ে যেতে পারেন নি। এর ই মধ্যে ডুয়ানে আরেকটি কাগজ, ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড শুরু করেন ১৭৯৪ সালে। ইতিমধ্যে তার বাড়িতে দু''বার অভিযান চালানো হয় এবং সেইজন্য তিনি কাগজটিকে বিক্রি করে নতুন মালিকের কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন এবং কাজটি ১ জানুয়ারি, ১৭৯৫ শেষ হয়। ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৭৯৪ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে কোনো কথা ও তথ্য ছাড়া এবং তার ভারতবর্ষের কোনো সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাকে ইংল্যান্ডে নির্বাসন দেওয়া হয়।

১৭৮৯ সালে, লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। সেই সময় ''এশিয়াটিক মিরর'' এর সম্পাদক মিঃ ব্রুস একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ইউরোপীয় এবং স্থানীয় জনসংখ্যার আপেক্ষিক শক্তি নিয়ে। ওয়েলেসলি ক্ষিপ্ত হয়ে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় স্যার আলফ্রেড ক্লার্ককে ১৭৯৯ সালের এপ্রিল মাসে লেখেন:

'আমি সম্পাদকদের আচরণের নিয়ম প্রেরণের চেষ্টা করবো কিন্তু আপনি যদি সমস্যাজনক সংবাদপত্রগুলিকে শান্ত করতে না পারেন তাহলে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে দমন করুন এবং তাদের লোকজনদের ইউরোপে পাঠিয়ে দিন।'

এই হুমকি ততণাতকার্যকর করা হয়েছিল এবং নিয়মের একটি নতুন সেট তৈরি করা হয়েছিল।

১৩ মে, ১৭৯৯ সালে যা প্রেসের স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। নিয়মাবলীর মধ্যে এইগুলো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. একটি সংবাদপত্রের প্রতিটি মুদ্রক তার নাম সংবাদপত্রের নীচে মুদ্রণ করতে বাধ্য।

২. প্রতিটি সম্পাদক এবং কাগজের স্বত্বাধিকারী তার নাম ও থাকার জায়গা থেকে সরকারি সচিবকে সংবাদপত্র সরবরাহ করবে।

৩. রবিবার কোন কাগজ প্রকাশিত হবে না।

৪. কোনও কাগজ আগে প্রকাশিত হবে না যতক্ষণ না এটি সরকারের সচিব বা সরকারের অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি দ্বারা পরিদর্শন করা হচ্ছে।

৫. উপরোক্ত যে কোনও বিধিবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করার শাস্তি অবিলম্বে নির্বাসন।

এই নতুন নিয়মাবলী সেই সময়ের বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রিন্টারদের জানানো হয়েছিল। সম্পাদকরা এই নিয়মাবলী কে হতাশার চোখে দেখেছিলেন তবুও তারা তাদের বিরক্তি প্রকাশ করেননি।

১.২.৬ ১৯ শতকের ভারতীয় প্রেস

উনিশ শতক ভারতীয় ও ব্রিটিশদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। একদিকে ব্রিটিশরা তাদের অবস্থান একীভূত করেছিল এবং অন্যদিকে ভারতীয়রা বুঝতে পেরেছিল যে কোনও বিদেশি প্রশাসন তাদেরকে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের

মোকাবিলা করার দায়িত্ব নিতে পারে না। এই ভাবনা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন এবং ভারতীয় জনসচেতনতাকে প্রেরণা এবং উতাহ দিয়েছিল।

প্রেসের প্রতি সরকারের দমনমূলক নীতিতে, ১৯ শতকের প্রথম দশকে কোনও বড় পরিবর্তন আনা হয়নি সরকারের তরফ থেকে। সংবাদপত্রকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো আর সেই জন্য সংবাদপত্রের তরফ থেকে একটা খবর ও তাদের বিরোধিতা করলে করা ব্যবস্থা নেওয়া হতো। সেই সময়কার প্রেস এর প্রতি প্রশাসনের মনোভাব নিম্নোক্ত মতামতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, যা মাদ্রাজের গভর্নর মিস্টার এলিয়ট একটা লেখায় বয়ান করেছেন: "যারা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা চায় তাদের উদ্দেশ্যগুলি হ''ল পসমাজের সবচেয়ে খারাপ রাজনৈতিক মতবাদ রচার করা, ইউরোপ এবং এশিয়ার কর্তৃপক্ষদের কে অবজ্ঞা করা এবং আইনজীবীদের কে মানহানির কেস দিয়ে লাভের মুখ দেখানো।"

লর্ড ওয়েলেসলি প্রেসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। এই সমস্ত বিধিনিষেধ কে অমান্য করে প্রচুর পরিমাণে প্যামফ্লেট প্রকাশ করা শুরু হলো যেগুলোতে লেখকদের নাম বা প্রিন্টারদের নাম ছাপা থাকতো না। লর্ড মিন্টো, যিনি লর্ড ওয়েলেসলের পরে গভর্নর জেনারেল হিসাবে আসেন তিনি ১৮১১ সালে কিছু নির্দেশ জারি করে বলেন যে সব মুদ্রণ সংস্থা গুলিকে মুদ্রাকর এর নাম তাদের সংবাদপত্রে ও বিজ্ঞাপনে ছাপতে হবে। যারা এই নির্দেশিকাকে অমান্য করবেন তারা সরকারের তীব্র বিরক্তির মুখে পড়বেন।

১৮১৩ সালে লর্ড হেস্টিংস গভর্নর হন - জেনারেল। তিনি অনেক ধৈর্যের সাথে ভারতীয় প্রেস এর সম্মুখীন হন। ১৮১৪ সালে ডঃ জেমস ব্রাইস "এশিয়াটিক মিরর" এর সম্পাদক হন। কিছুদিন পর তার মিঃ জন আদম, যিনি সেই সময় প্রধান সচিব ও সেন্সর ছিলেন, এর সাথে তীব্র বিরোধ বাধে যার ফলে ডঃ জেমস ব্রাইস, মিঃ জন আদম এর বিরুদ্ধে বারংবার লেখালেখি করেন। কিন্তু তার কোনো উপস্থাপনাই কার্যকরী হয়নি।

প্রাক-সেন্সরশিপ অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়। যখন সম্পাদক হিটলিকে তার সংবাদপত্র মর্নিং পোস্ট থেকে কিছু অংশ বাদ দিতে বলা হয়

তখন তিনি দাবি করেন যে তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না যেহেতু তিনি প্রকৃতিগতভাবে ভারতের বাসিন্দা (তার বাবা ইউরোপীয় এবং মা ভারতীয়)। প্রেস সেন্সর তখন গভর্নর - জেনারেল কে জানালেন যে তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করা সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ। লর্ড হেস্টিংস সেন্সর এর পদটিকে বাতিল করেছিলেন ১৮১৮ সালে এবং সম্পাদকদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে সরকারি কাজের বিরুদ্ধে বা জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকারক কোনো খবর যাতে প্রকাশিত না হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু উচ্চ পদস্থ অফিসারদের তার এই মতামত ভালো লাগেনি। সেই জন্য তাদেরকে খুশি করার জন্য হেস্টিংস কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কেমন ধরণের খবর প্রকাশিত করা যাবে না সেইটা তিনি বিস্তারিত জানিয়েছিলেন।

আদালতের পদক্ষেপ ও কার্যনির্বাহী পরিচালক, বা ইংল্যান্ডের অন্যান্য সরকারী কর্তৃপক্ষ যার সাথে ভারত সরকার সংযুক্ত রয়েছে বা রাজনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বাতিল করার ঘটনা নীয় প্রশাসন বা কাউন্সিলের সদস্যদের (সুপ্রিম কোর্টের বিচারকমন্ডলী বা কলকাতার লর্ড বিশপ) কাজের প্রতি আপত্তিকর মন্তব্য

আলোচনা যা স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সন্দেহ তৈরি করতে পারে বা কোনো ধার্মিক চিন্তাভাবনার বিরোধিতা করতে পারে।

কোনো ইংরেজি বা অনন্য ভাষার সংবাদপত্র থেকে কোনো রচনাংশ পুনঃপ্রকাশ করা যা ইংরেজ শাসনের উপর কোনোভাবে আঘাত আনতে পারে।

ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারী এবং কিছু মানুষের ব্যক্তিগত মন্তব্য যা সমাজে উত্তেজনা ছড়াতে পারে।

যদিও এই নিয়মাবলীর ফলে প্রেস এর উপর তদারকি করা হয় তবুও মানুষ খোলামনে এই নিয়মগুলিকে স্বাগত জানিয়েছিল। এই নতুন বিধি প্রেসকে আবার অনেকটা খোলা মনে ও স্বাধীন ভাবে কাজ করার দিক দেখিয়েছিলো।

১.২.৭ জেমস সিল্ক বাকিংহাম ও রাজা রাম মোহন রায়

এই সময়কালে তিনজন মানুষ ভারতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা হলেন জেমস সিল্ক বাকিংহাম, উনি প্রেসে স্বাধীনতার অনির্বাচিত যোদ্ধা, দ্বিতীয় রাজা রাম মোহন রায় যার সংবাদপত্র হিন্দু সামাজিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাস এর বিরোধিতা করেছিল এবং লর্ড হেস্টিংস যিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করেছেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সরকারের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকর সুরক্ষা হলো প্রেসের সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করার স্বাধীনতা যা প্রশাসনের হাত শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

ছবি সৌজন্যে- National Portrait

সেই একই বছরে, ১৮১৮ সালে, জেমস সিল্ক বাকিংহ্যাম তার সংবাদপত্র ”ক্যালকাটা জার্নাল” শুরু করেছিলেন। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং কোম্পানির একচেটিয়াকরণ, কর আদায় ইত্যাদি নিয়ে লিখতে লাগলেন। ১৮১৯ সালে তাকে ততালীন মাদ্রাজের গভর্নরকে কলমের মাধ্যমে আক্রমণ করার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল এবং ১৮২৩ সালে তাকে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যখন জন আদম গভর্নর- জেনারেল হিসেবে কাজ করছিলেন।

ছবি সৌজন্যে- wikipedia

১৮২২ সালে রাজা রাম মোহন রায় ”সংবাদ কৌমুদি” নামক এক আঞ্চলিক সংবাদপত্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ফারসি ভাষায় ”মিরাট উল আকবার ” নামক একটি কাগজও প্রকাশ করেছিলেন।

বাকিংহামের নির্বসনের সঙ্গে সঙ্গেই, জন আদম, যিনি তখন ভারপ্রাপ্ত গভর্নর - জেনারেল ছিলেন, একটি নয় দফা অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন যার ফলে প্রতিটি প্রকাশনার রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যার মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ছিলেন তারা যৌথ ভাবে একটি পিটিশন জমা দেন তবে তা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি যার প্রতিবাদে রাজা রাম মোহন রায় তার পত্রিকাগুলি বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

১.২.৮ স্যার চার্লস মেটকাফ (Sir Charles Metcalfe)

স্যার চার্লস মেটকাফ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক এর পর গভর্নর জেনারেল হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। তার প্রেসের স্বাধীনতার প্রতি একটা বিশেষ ভালোবাসা ছিল। উনি তার কোম্পানির সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইউরোপীয়

ও ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্য একটা জার্নাল আইন তৈরী করতে চাইলেন। মেটকাফ তার কাউন্সিল এর আইনি সদস্য, মাকাউলিকে নিয়ে বিদ্যমান কঠোর প্রেস আইন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

মাকাউলি উল্লেখ করেছিলেন যে লাইসেন্সিং বিধিমালাকে বাতিল করা উচিত। লর্ড মাকাউলির মতামতের সাথে একমত হওয়ার সময়, গভর্নর - জেনারেল মতামত দিলেন যে যেহেতু প্রেস আইনগুলি বিভিন্ন প্রদেশে আলাদা রকমের সেই জন্য সমগ্র ভারতের জন্য একটা সাধারণ আইন কার্যকর করা খুবই জরুরি। গভর্নর - জেনারেল কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা সরকারের স্থানীয় প্রেসের উপর নজরদারি রাখার দিকে জোর দিয়েছিলেন।

তবে কাউন্সিল একটি নতুন আইন তৈরি করলো যার ফলে ১৮২৩ সালের বেঙ্গল রেগুলেশন এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ সালের বোম্বে প্রেস রেগুলেশনকে বাতিল করা হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত অঞ্চলগুলিতে এই আইন প্রযোজ্য করা হয়েছিল এবং প্রিন্টার এবং প্রকাশকের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে একটি ঘোষণা জমা দিতে বলা হয়েছিল। আইন এ এই পরিবর্তন আনার জন্য স্যার চার্লস মেটকাফের কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এর অসন্তুষ্টির মুখে পড়তে হয়েছিল। ১৮৩৫ সালের মেটকাফের আইন বেঙ্গল, বোম্বে ও মাদ্রাজে ভারতীয় প্রেসের দ্রুত বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

সংবাদমাধ্যমের সমস্ত বিধিনিষেধ অপসারণের খবর যখন ইংল্যান্ডে পৌঁছয়ে তখন কোর্ট অফ ডিরেক্টরস রা ক্ষুব্ধ হয়ে ১৮৩৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারিতে একটি চিঠিতে বলে যে তারা এই পদক্ষেপকে ভালো চোখে দেখছেন না এবং সেই জন্য তার সমর্থন করছেন না। এই পদক্ষেপকে তারা সাময়িক বলেও ব্যাখ্যা করে। প্রেস এর স্বাধীনতার প্রতি তার ভালবাসার জন্য মেটকাফকে খুব ভারী মূল্য দিতে হয়েছিল। প্রেসের তার ন্যায্য দাবি সত্ত্বেও তাঁকে স্থায়ী গভর্নর জেনারেল করা হয়নি। ১৮৩৬ সালে মেটকাফকে মাদ্রাজের গভর্নর-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

লর্ড অকল্যান্ড এর সময়কালেও প্রেস ও সরকারের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। এই সময় পার্সিয়ান ভাষায় পাঁচটি সংবাদপত্র চালু করা হয়। লর্ড এলেনবোরো যিনি ১৮৪২ সালে লর্ড অকল্যান্ডের পরে এসেছিলেন তার প্রেস এর প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিলনা। তার ফলে সরকার ও প্রেসের মধ্যে একটা গভীর খাদ তৈরী হয়। সরকার নির্দেশ এর মাধ্যমে অফিসিয়াল অর্ডার এবং আলোচনা প্রকাশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো। তার ফলে একটি প্রশ্ন উঠে এলো যে কোন তথ্যটি সরকারী ভাবে প্রেসে জানানো উচিত এবং কোনটি জানানো উচিত নয়?

আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে সতী, বর্ণ, বিধবা পুনর্বিবাহ, নীল চাষীদের আন্দোলন এবং তরুণ ম্যাজিস্ট্রেটদের ভুল নিয়ে আলোচনা হতে লাগলো। ১৮৫৬ সালে, লর্ড ক্যানিং গভর্নর জেনারেল হন। তিনি ডালহৌসি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন কিন্তু ডালহৌসির দ্বারা বপন করা বীজগুলি তখন অংকুরিত হয়ে গেছে। আসলে বীজগুলি কোনও বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা নয় বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভিত্তিক আদর্শের দ্বারা বপন করা হয়েছিল। সাথে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার প্রেসকে শায়েস্তা করার জন্য একটি বিধি আনলেন যার মিল আমরা ১৮২৩ সালের প্রেস আইন এর সঙ্গে পাই। সিপাহী বিদ্রোহ সরকারের মনের মধ্যে আশংকার

জন্ম দেয় আর তাদের মধ্যে মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখার একটা মনোভাব তৈরী হয়। মুদ্রণ প্রেস প্রতিষ্ঠা কে নিয়ন্ত্রণে আনার এবং বইপত্রের সংবহন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং 'Act XV of ১৮৫৭' চালু করেন।

আইনটি সব রকমের ভাষার সংবাদপত্রের প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা সে ভারতীয়দের মালিকানার অধীনেই হোক বা ইওরোপীযদের মালিকানার অন্তর্গত। সুতরাং, এই আইনটি অ্যাডামের লাইসেন্সিং বিধিমালার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আবার চালু করে। এই আইনটি সমগ্র ভারতেবর্ষের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

১.২.৯ উপসংহার :

সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতীয় প্রেস একটি নতুন দিশা পায়। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। আঞ্চলিক ভাষাগত সংবাদপত্র আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যেহতু তারা জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নিজের ভাষায় খবর সরবারহ করতে পারেন।

১.২.১০ সারাংশ

ভারতে সংবাদপত্রের আবির্ভাব মোগল দের সময়ে হয়। তারা প্রশাসনিক কাজকর্মের তথ্যগুলো ওয়াকিয়া অথবা নিউজলেটার হিসেবে রাখতেন। এই থেকেই তথ্য প্রকাশের ব্যাপারটা আসে। কিন্তু ভারতের প্রথম সংবাদপত্র শুরু করেন জেমস অগাস্টাস হিকি নামক একজন ইংরেজ। ক্ষমতাশালী লোকেদের বিরুদ্ধে খবর ছাপানোর জন্য তাকে জরিমানা করা হয় যা দিতে না পেরে অবশেষে তিনি তার সংবাদপত্রটিকে বন্ধ করে দেন। হিকের দেখানো দিক অনুসরণ করে আরো অনেক সংবাদপত্র চালু হয়। পরবর্তীকালে লর্ড ওয়েলেসলির সময় সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে কিছু কঠোর আইন আনা হয়। জেমস সিল্ক বাকিংহাম ও রাজা রাম মোহন রায় তাদের সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। জন আদম এর ১৮২৩ সালের লাইসেন্সিং প্রবিধান (এডামস গ্যাগ) প্রেসর উপর নিষেধাজ্ঞা আরো প্রবল করে তোলে। স্যার চার্লস মেটকাফ ক্ষমতায় আসার পর ১৮২৩ সালের লাইসেন্সিং প্রবিধান কে অনেক শিথিল করে দেন যার ফলে কোম্পানির লোকেরা তার উপর ক্ষুব্দ হন

লর্ড ক্যানিং এর সময় এমন একটি বিধি আনা হলো যার মিল আমরা ১৮২৩ সালের এডামস গ্যাগ এর সঙ্গে পাই। মুদ্রণ প্রেস প্রতিষ্ঠা কে নিয়ন্ত্রণে আনার এবং বইপত্রের সংবহন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং 'Act XV ১৮৫৭' চালু করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদী মনোভাব অবলম্বন করলো।

১.২.১১ অনুশীলনী

১. মোগলদের সময় প্রশাসনিক কাজকর্মের বার্তাগুলো কি ভাবে প্রচার করা হতো?

২. হিকির বেঙ্গল গেজেটে সম্বন্ধে আলোচনা করো?

৩. ভারতীয় প্রেসর উপর ইংরেজদের নিষেধ্যাজ্ঞা জারির কারণগুলি কি কি?

৪. রাজা রামোহন রায় কয়েকটা সংবাদপত্রের বিষয়ে আলোচনা কর?

৫. স্যার চার্লস মেটকাফ কে ভারতীয় প্রেসের মুক্তিদাতা ক্যানো বলা হয়?

১.২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

- মার্গারিটা, বি. (১৯৪০). দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস: এ হিস্ট্রি অফ দ্য গ্রোথ অফ পাবলিক ওপিনিয়ন ইন ইন্ডিয়া. জি অ্যালেন এন্ড এডউইন.
- চালাপতী রাও, এম. (১৯৭৪). দ্য প্রেস. ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট.
- চক্রবর্তী, এস. (১৯৭৬). দ্য বেঙ্গল প্রেস, ১৮১৮-১৮৬৮: স্টাডি ইন দ্য গ্রোথ অফ পাবলিক ওপিনিয়ন.
- কাকবা প্রিয়লকার, এ. (১৯৫৮). প্রিন্টিং প্রেস ইন ইন্ডিয়া: ইটস বেগিননিংস এন্ড আর্লি ডেভেলপমেন্ট. বম্বে ইউনিভার্সিটি প্রেস.
- সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত : ড. নন্দলাল ভট্টাচার্য্য। (লিপিকা)

মডিউল ১ ভারতে প্রেসের ইতিহাস

একক - ৩ ◻ ১৮৫৭ এর পরে ভারতীয় প্রেসের বিকাশ

১.৩.০ গঠন

১.৩.১ উদ্দেশ্য

১.৩.২ প্রস্তাবনা

১.৩.৩ সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রেস আইন

১.৩.৪ ভার্নাকুলার প্রেসের সূচনা

১.৩.৫ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট

১.৩.৬ উপসংহার

১.৩.৭ সারাংশ

১.৩.৮ অনুশীলনী

১.৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক এর উদ্দেশ্য মূলত ছাত্র ছাত্রীদের ভারতীয় প্রেস সম্বন্ধে অবগত করা। এ ছাড়াও ছাত্র ছাত্রীরা জানতে পারবে যে ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের পর কি ভাবে স্থানীয় ভাষার কাগজগুলি মানুষজনদের মধ্যে জাতীয় সচেতনতা এবং প্রেরণা জাগিয়েছিল ব্রিটিশদের অপ্রীতিকর নীতির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করার। ব্রিটিশ সরকার ভার্নাকুলার কাগজের প্রভাব কমিয়ে ফেলার জন্য ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাস করে যার ফলে ভারতীয় ভাষার খবরেরকাগজের উপর প্রবল প্রভাব পরে। আমরা ব্রিটিশ সরকারকে নীতি এবং ভারতীয় প্রেস এর তাদের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

১.৩.২ প্রস্তাবনা

যেই সময় ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়, সেই সময় প্রেসের বিকাশে একটি ধাক্কা লেগেছিলো। ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের ফলে প্রেসের স্বাধীনতা কঠোরভাবে কমানো হয়েছিল। ১৮৫৮ সালের আগস্টে ব্রিটিশ সংসদ একটি আইন পাস করে যা কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে, ভারতের শাসন ব্যবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ইংল্যান্ডের রানীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই আইনটি ভারতীয় ইতিহাসে একটি নতুন পর্ব আনলো যা ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল এবং এই নতুন ব্রিটিশ রাজের শাসনকাল স্থাপিত করেছিল যা ১৯৪৭ এর আগস্ট মাস অব্দি চলেছিল। ১৮৫৯ সালে, লর্ড ক্যানিং

ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসেন আর ১৮৬০ সালে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড পেনাল কোড গৃহীত হয়েছিল। বাংলার বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র যেমন নীল দর্পণ, দ্য হিন্দু,প্যাট্রিয়ট, সোমপ্রকাশ, ইন্ডিয়ান মিরর, বেঙ্গালি এবং আরও কয়েকটি খবরের কাগজ ভারতীয় জনমতকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার আবির্ভাব, প্রথমে বাংলা ভাষায় এবং পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষায়, ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটা আমূল পরিবর্তন এনেছিল। এই সময় দেশে ভারতীয় ভার্নাকুলার সংবাদমাধ্যমে বৃদ্ধি দেখা গেল। এই সময় প্রায় সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দি, মারাঠি, উর্দু, তামিল, গুজরাটি, মালায়ালাম, কামদা, পাঞ্জাবি এবং অন্যান্য ভাষার সংবাদমাধ্যমের মধ্যে বাংলা ভাষার সংবাদমাধ্যম অবশ্যই এগিয়ে ছিল।

১.৩.৩ সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রেস আইন

লর্ড অকল্যান্ড মেটকাফের পর গভর্নর জেনারেলের পদে ছিলেন ১৮৪২ সাল অব্দি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম অকল্যান্ডকে মনে রেখেছে তার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলা এবং মেটকাফের উদার আইনকে সমর্থন করার জন্য। তাঁর শাসনকালে তার সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে সিপাহীদের দ্বারা একটি বিদ্রোহ শুরু হলো। এই বিদ্রোহ ভারতীয়দের দ্বারা ব্রিটিশদেরকে সশস্ত্র প্রচেষ্টায় বের করার শেষ চেষ্টা ছিল। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সাথে সাথে সরকার অ্যাডাম-এর ১৮২৩ সালের প্রেস আইনগুলির অনুরূপ একটি অধ্যাদেশ দিয়ে প্রেসকে চাপে রাখার ব্যবস্থা করে। এটি ছিল লর্ড ক্যানিংয়ের কুখ্যাত গ্যাগিং আইন, যিনি তখনকার গভর্নর জেনারেল ছিলেন এবং যার অধীনে সংবাদপত্রে এবং সাময়িকীতে নানা বিধিনিষেধ চাপানো হয়েছিল। কোনও কাগজ বা সাময়িকী চালু করার ক্ষেত্রে একটি অনুমতি প্রয়োজন ছিল এবং সরকার এ ধরণের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিচক্ষণতা লক্ষ্য করা শুরু করলো। এই অধ্যাদেশটি সমানভাবে ভারতীয় এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পেপারগুলির উপরে প্রযোজ্য করা হয়। এই সেন্সরশিপটির মেয়াদ ছিল এক বছর। 'গ্যাগিং অ্যাক্ট', সংবাদপত্র প্রকাশকদের লাইসেন্স প্রাপ্ত করা এবং সংবাদ প্রকাশের পূর্বে সরকারকে পরীক্ষার জন্য উপকরণ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করেছিল। লর্ড ক্যানিং, ভারতে তার সুখ্যাতি বাড়ানোর জন্য ১৩ই জুন, ১৮৫৮ সালে 'গ্যাগিং আইন' টি তুলে নেওয়ার অনুমতি দিলেন।

লর্ড লরেন্স ১৮৬৪ সালে ভারতের ভাইসরয় হন। তাঁর প্রশাসনের সময়ই এক যুগান্তকারী আইন 'প্রেস এন্ড রেজিস্ট্রেশন অফ বুক অ্যাক্টে' পাস হয়েছিল ১৮৬৭ সালে। এই আইন এর সারমর্ম সংবাদমাধ্যমের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস এবং এটি কী করতে সক্ষম তার উপরেই মূলত। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে মুদ্রণ প্রেসগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত রাখা এবং সংবাদপত্রগুলিকে ও মুদ্রণ প্রেসগুলিকে কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ না করা। এছাড়াও মেটকাফের লিবারেশন আইন বাতিল করা হয়, যদিও মেটকাফের আইনের এক্ট দুই এর সমস্ত বিধানগুলিকে নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। জনসাধারণের স্বার্থের উদ্দেশ্যের যুক্তি ব্যবহার করে ব্রিটিশরা 'রুল অফ ল' এর জন্য আবেদন করেছিল এবং যুক্তি দিয়েছিল যে জনসাধারণের শৃঙ্খলা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। ১৮৭০ সাল থেকে, ভারতীয় দন্ডবিধি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রসারিত করা হয়েছিল সংবাদমাধ্যমের দ্বারা জনসাধারণের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে 'গঠনমূলক' হুমকিগুলির বিরুদ্ধে উচিত ব্যবস্থা নিতে। এই আইনটির নির্দিষ্ট কিছু প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আইনের অংশ হিসেবে বেঁচে আছে।

১৮৮১ সালে লর্ড রিপন, যিনি সেই সময় ভাইসরয় হিসেবে এসেছিলেন, তিনি এই আইনটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। রিপনকে এই আইনটি বাতিল করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। রিপন, তার

নীতিমালা অনুসারে সমঝোতা এবং সংস্কার এর পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং ভার্নাকুলার প্রেসের মুক্তির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, কিন্তু আইনটি ভারতীয়দের মধ্যে যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিলো তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াইয়ের জন্মে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয়তাবাদী প্রেস এবং ব্রিটিশ শাসনের মধ্যেকার সম্পর্কে উত্তেজনা এবং সংঘাত অব্যাহত ছিল।

১৮৩৫ সালে, যখন মেটকাফ ভারতীয় সমগবাদমাধ্যমকে মুক্ত করেছিযেন, সেই সময়টি ভারতীয় প্রেসের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল। ১৮৩৫ থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ভারতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে কাঁধে কাঁধ দিয়ে চলেছে এবং দেশকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময় প্রেসের সমস্ত বিভাগের উত্থান দেখতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই কারণেই মেটকাফকে 'প্রেসের মুক্তিদাতা' বলা হত। সামাজিক এবং ধর্মীয় যুক্তিগুলি গণমাধ্যমে ছাপানো হয়েছিল এবং সংবাদমাধ্যমকে স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম চারদিক থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে। মেটকাফ এমন একটি নিখুঁত আইন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যা সমগ্র ভারতীয় সাম্রাজ্য জুড়ে অভিন্ন থাকবে। কতৃপক্ষ ইংল্যান্ডের শাসকগোষ্ঠী মেটকাফের পদক্ষেপকে অসন্তুষ্টির সাথে দেখেছিলেন, তবুও ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আগামী কুড়ি বছর ধরে লড়াই চালিয়ে গেছে। শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে পত্রিকার চাহিদা দিনে দিনে বেড়েছিল এবং সেই জন্য বাংলায় একুশটি ভার্নাকুলার সাময়িকী শুরু হয়।

১.৩.৪ ভার্নাকুলার প্রেসের সূচনা

ভারতে দিগদর্শন ছিল প্রথম দেশীয় সংবাদপত্র। এটি ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশনারির উইলিয়াম ক্যারি , জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড শুরু করেছিলেন। তারা শীঘ্রই একই বছরের জুনে একটি অন্য জার্নাল শুরু করেন এবং এর নাম সমাচার দর্পণ রাখেন। কোনো ভারতীয় দ্বারা প্রকাশিত প্রথম ভার্ণাকুলার পত্রিকাটি বাংলা ও ফারসি ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলি আঞ্চলিক সাংবাদিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, রাজা রামমোহন রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে রামমোহন রায় অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক যিনি তাঁর জার্নালগুলি প্রচলিত রীতিনীতির সমালোচনা করতে ব্যবহার করেছিলেন বিশেষ করে যে রীতিনীতিগুলি ভারতীয় সমাজকে পিছিয়ে রেখেছিল। তিনি আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যা যুক্তিসঙ্গত এবং সমতাবাদী রীতি নীতি অনুসরণ করে নিয়ে আসা যায়। হুগলী জেলার রাধানগরে তাঁর জন্ম ১২ ই মে ১৭৭২ সালে হয় এবং ছোটবেলা থেকেই তিনি গতানুগতিক রীতিনীতির শিকার হয়েছিলেন। রাম মোহন তাঁর জার্ণালগুলির দ্বারা চেষ্টা করেছিলেন একদিকে মিশনারিদের সমালোচনার বিরুদ্ধে লড়াই করা, এবং অন্যদিকে ভারতীয়দের শিক্ষিত সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে শিক্ষিত করা। রাম মোহন রায়ের ভার্নাকুলার কাগজপত্রগুলি ভারতীয়দের বিতর্কিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছিল। এইভাবে, তিনি জাতীয় সমস্যা প্রকাশ্যে এনে মানুষজনকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি, বাংলা এবং ফারসি ভাষায় সাময়িকীও বের করেছিলেন। এগুলির নাম ছিল সংবাদ কৌমুদী, ব্রাহ্মীনিক্যাল ম্যাগাজিন, মীরাত-উল-আখবার বঙ্গদূত এবং বেঙ্গল হেরাল্ড। সংবাদ কৌমুদী এবং মীরাত-উল-আখবর চেষ্টা করেছিলেন পাঠকের আগ্রহের বিভিন্ন দিক কে বোঝার চেষ্টা করেছিল। খবরের কাগজগুলিতে যে খবরগুলি প্রধান ভাবে স্থান পেতো তার মধ্যে ছিল স্থানীয় খবর যেমন জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু তার পাশাপাশি থাকতো ভারত ও বিশ্বের ঘটনাবলির রিপোর্ট; ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কারের বিষয় নিবন্ধ, বিশেষত অমানবিক সতীদাহ প্রথাকে বন্ধ করার প্রয়োজনিয়তা; এবং শিপিং ও বাণিজ্যিক সংবাদ। পারসী ভাষার সাপ্তাহিক মিরাত-উল-আখবর

আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিকে তার কাগজে অনেক বেশি জায়গা দিত। এই সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যাটিতে চীন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ ছিল এবং রাশিয়া ও তুর্কির শাসকের মধ্যে চাপা উত্তেজনার কারণগুলির বিশ্লেষণ করেছিল।

বাংলায় রাম মোহন রায়ের বাণী খুব শীঘ্রই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি জাতীয় চেতনাকে আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতীয়দের মালিকানাধীন সংবাদপত্র দেশের বিভিন্ন জায়গায় চালু হতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের পক্ষে ছিলেন। এই জাগরণের ফলে নাগরিকদের সমিতি গঠন হয়েছিল যার সদস্যরা মূলত আইনজীবি, শিক্ষক এবং অন্যান্য বিভাগের ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন। এছাড়া এই সময় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের উত্থানও দেখা যায়।

ব্রিটিশদের কাছে, দেশীয় সংবাদমাধ্যম এমন একটি ভারতকে উন্মোচিত করেছিল যা তারা কেবল ক্ষণিকভাবে আন্দাজ করেছিলেন এবং সঠিকভাবে ভয় পেয়েছিলন। প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই সংবাদপত্রগুলির প্রভাব বুঝতে সময় লাগে যেহেতু তাদের খুব কম আধিকারিকরাই স্থানীয় ভাষা ছিলেন। এর পরে আস্তে-আস্তে যখন ব্রিটিশরা এই সংবাদপরগুলির ক্রমশ বিস্তৃত পাঠকবৃন্দ এবং প্রকাশনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সচেতন হন তখন তারা 'নির্ভরযোগ্য' ভারতীয় মধ্যস্থতাকারীদের দিয়ে এই সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুগুলি যাচাই করা শুরু এইটা বোঝার জন্য যে এই পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক আন্দোলন বা ব্রিটিশবিরোধী অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলছে কি না। ১৮৭০ এর দশকে, ভারতীয় প্রেসের উপর ইতিমধ্যে যেই যেই কড়া নিয়মগুলি চাপানো হয়েছিল তা ছাপিয়ে গিয়ে ভার্নাকুলার প্রেসর উদ্দ্যেশে এমন একটি আইন আনা হলো যা আগের আইন থেকে আরো প্রখর ছিল।

১৮৬১ সালে, হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজে দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীল দর্পণ' নামক একটি নাটক সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল যা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার তাগিদ যোগায় যার প্রথম ধাপে জনগণকে সাদা ব্যবসায়ীদের জন্য ফসল চাষ করা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। এর ফলস্বরূপ একটি নীল কমিশন গঠন করা হয়। হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজটি প্রথমে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ এর তত্ত্বাবধানে ছিল এবং পরবর্তীকালে এটি আরো বেশি জনপ্রিয়তা হরিশ চন্দ্র মুখার্জীর সম্পাদনায় পায়। পরবর্তীকালে কাগজটি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অধীনে চলে আসে।

এই কাগজটি সরকারের বাড়াবাড়ির তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং সেই সঙ্গে দাবি করেছিল যে ভারতীয়দের শীর্ষস্থানীয় সরকারী পদে নিয়োগ করা হয়। আরেকটি সমসাময়িক পত্রিকা যা জনগণের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল তা হলো দ্য ইন্ডিয়ান মিরর। আরেকটি সাপ্তাহিক কাগজ, অমৃতবাজার পত্রিকা যশোর থেকে শিশির কুমার ঘোষের সম্পাদনায় সেই সময় প্রকাশনা শুরু করে। এই পত্রিকা মূলত মানুষের অভিযোগ দূরীকরণের সাথে সাথে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং সরকারের সমালোচনা করার উপরে জোর দিয়েছিলো।

১৮৭৪ সালের পয়লা জানুয়ারি শিশির কুমার ঘোষ তার কাগজে (অমৃতবাজার পত্রিকায়) লিখেছেন যে একমাত্র উপকরণ যার সাহায্যে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে তা হলো সংবাদপত্র। এই লেখার ফলস্বরূপ সংবাদপত্রের মালিকদের সরকারের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল। ১৮৭১ সালে এই পত্রিকাটি কলকাতায় চলে আসে এবং সেই সময়কার সমস্ত পত্রিকাগুলিকে দমন করার জন্য আরেকটি আইন পাস করা হয়।

ভার্নাকুলার প্রেস এবং ব্রিটিশ প্রেসগুলির মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যাচ্ছিলো। ১৮৫৭ এর বিদ্রোহে´পর এই পার্থক্যটি আরো প্রখর হয়ে উঠলো। ভারতের সাংবাদিকরা ছিলেন তাদের জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভক্ত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরেজি সাংবাদিকরা এক কণ্ঠে রক্তের জন্য রক্ত বলে চ্যাঁচাতে শুরু করলেন অন্যদিকে ভারতীয় সম্পাদকরা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে

এবং সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয় যেহেতু এটি তাদের নিজস্ব ভাষায় খবর ছাপছিলো। জাতীয় চেতনার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত প্রেসগুলি জনগণের মধ্যে প্রভাব ও শক্তি অর্জন করে যার ফলে তারা অনেক বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রেস এর ভারতীয় প্রেসের প্রতি ঈর্ষা জন্মায় এবং তারা সরকারের সমর্থন ও পেতে থাকে। সেই জন্য, ১৮২৩ সালের অ্যাডামের 'গ্যাগিং অ্যাক্ট' এবং ১৮৫৭ সালের ক্যানিংয়ের 'গ্যাগিং অ্যাক্ট' মূলত ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং স্থানীয়দের দ্বারা সম্পাদিত সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এবং ইংরেজদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের তুলনায় আরও বেশি সচল ছিল। ক্যালকাটা জার্নাল বাদে কোনও ইংরেজি সংবাদপত্রের লাইসেন্স ১৮২৩ সালে বাতিল করা হয়নি। সম্পাদকদের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল, তবে কোনও গুরুতর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্রের মধ্যে রাজা রাম মোহন রায় ইতিমধ্যেই মীরাত-উল-আখবরের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিয়েন এবং সংবাদ কৌমুদীর সাথেও তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও গ্যাগিং অ্যাক্টগুলি থেকে বাঁচতে কোনো রকমের রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশ করছিলো না। ক্যানিংয়ের 'গ্যাগিং অ্যাক্ট' যখন ১৮৫৮ সালে প্রত্যাহার করা হয়েছিল তখন ইংরেজি এবং ভারতীয় ভাষায় বইয়ের উতাদন,এর সঙ্গে ভারতীয় লেখকদের দ্বারা লেখা সংবাদপত্রগুলি পুনরায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সংবাদমাধ্যমের এই বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষজনের মধ্যে তাদের প্রভাব ও বৃদ্ধি পায়। ১৮৭০ সালে ভারতে ৬৪৪ টি কাগজ ছিল যার মধ্যে ৪০০ টি স্থানীয় ভাষায় ছিল। ভার্নাকুলার জার্নালগুলি ব্রিটিশ জার্নালের চেয়ে বেশি ছিল সংখ্যার এবং প্রভাব বিস্তারে অনেক বেশি সফল ছিল।

১.৩.৫ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট

ব্রিটিশেরা যখন নিশ্চিত হলো যে স্থানীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি মানুষজনদের মধ্যে জাতীয় চেতনার জন্ম দিচ্ছি তখন লর্ড লিটন, ১৮৭৮ সালের পয়লা মার্চে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাস করলেন যা স্থানীয় ভাষার প্রকাশনাগুলির বিরুদ্ধে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনার ব্যবস্থা নিয়েছিল। এই আইনটিকে অন্যতম কঠোর আইন মনে করা হয় যেহেতু এই আইন সরকারকে আরও বেশি ক্ষমতা দিয়েছিলো রাষ্ট্রবিরোধী লেখাকে কড়া হাথে দমন করা এবং সরকারের প্রতি অসন্তুষ্টি তৈরী করা কাগজের বিরুদ্ধে উচিত পদ্দক্ষেপ নেওয়া। এই আইনটি যেকোন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অথবা শহরের কোনো কমিশনার বা পুলিশকে ক্ষমতা দিয়েছিল যে প্রকাশক এবং মুদ্রাকরকে যেকোনো নির্দিষ্ট ধরণের লেখা ছাপাতে বাধা দেওয়ার অধিকার তাদের থাকবে, এছাড়াও তাদের বিবেচনার ভিত্তিতে তারা ছাপা কাগজকে এবং মুদ্রণ উপকরণকে বাজেয়াপ্ত বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও পেয়েছিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশকদের কিছু টাকা সিকিউরিটি হিসেবে জমা রাখা বাধ্যতামূলক ছিল এবং এই টাকাটা চাইলে সরকার বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা রাখতো। সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের সমস্ত প্রুফ শীট প্রকাশের আগেপুলিশের কাছে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক ছিল। যে কোনো মামলার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হত এবং আদালতে এ জাতীয় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনও আপিল করা সম্ভবপর ছিল না। যদি আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্র কোনও সরকারী সেন্সরের কাছে তাদের কাগজের প্রুফ শিট জমা দিতে পারে তবে এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা ছাড় পেতে পারে।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ইংরেজি ভাষার প্রকাশনাকে তার পরিধির মধ্যে আনেনি। স্থানীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি এই অ্যাক্ট এর বিরোধিতায় ফেটে পরে। ১৮৮০ সালে দেখা যায় যে ভার্নাকুলার কাগজগুলির ভাষা এবং শৈলীতে একটা পরিবর্তন হয়েছে যার ফলে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আইনটি ১৮৮২ সালের অ্যাক্ট III অনুযায়ী প্রত্যাহার করা হয় এবং পোস্ট অফিসের আধিকারিকদের ক্ষমতা দেওয়া হয় যেকোনো ভার্নাকুলার কাগজে রাষ্ট্রবিরোধী লেখা বেরোলে তাকে বাজেয়াপ্ত করার।

১.৩.৬ উপসংহার

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠনে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজা রামমোহন রায় থেকে কেশব চন্দ্র সেন, গোখলে, তিলক, ফিরোজশাহ মেহতা, সুভাষ চন্দ্র বসু, সি আর দাস, দাদাভাই নওরোজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সি ওয়াই চিন্তামণি, মতি লাল নেহরু, মদন মোহন মালাভিয়া, এম.কে. গান্ধী এবং জওহরলাল নেহেরুর মতো নেতারা সংবাদমাধ্যমকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী জনমত সংহত করা এবং জাগ্রত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তারা সরকারের নীতিগুলির সমালোচনা করেছিল এবং জনসাধারণকে রাজনৈতিক সমস্যাগুলি প্রেসের মাধ্যমে বোঝানোর জন্য শিক্ষিত করল। তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সংগ্রামের পদ্ধতি জনগণদের জানিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। এই জন্য সেই সময়ে দৈনিক এবং সাময়িকী উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেল। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রেসের অবদান মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

নতুন শতাব্দীর আগমনে সংবাদপত্রের সংখ্যা আরো বেড়েছিল বিশেষত ভার্নাকুলার প্রেস যা জাতীয় চেতনা জাগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলো সর্বদা সরকারী ব্যবস্থা এবং নীতি সমর্থন করে চলেছিল যার ফলে ভারতীয় এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদমাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য আরো বেশি জোরদার রূপ নিলো। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে কথা বলছিলো আবার অন্যদিকে আংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলো সরকারের পক্ষে কথা বলা চালু রেখেছিলো। সরকারও সেই জন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ার কাগজপত্রের পক্ষে ছিল এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের বিরোধিতা করেছিল।

১.৩.৭ সারাংশ

বর্ণবাদী তিক্ততা যা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে প্রণোদিত করেছিল সেইটাই ১৮৫৮ সালের পরে ইউরোপীয় প্রেসগুলির সর্বদা রাজনৈতিক বিতর্কে সরকারকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ভার্নাকুলার সংবাদপত্রগুলি ব্রিটিশ সরকারের নীতিগুলির বিরোধিতা করেছেন এবং জনসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা করেছে। ভারতের ততালীন গভর্নর জেনারেল লিটনের ভয়াবহ নীতি এবং ১৮৭৬-১৮৭৭ এর দুর্ভিক্ষের ঘটনাকে যথাযথ ভাবে নিষ্পত্তি না দেওয়াতে ভার্নাকুলার প্রেসে ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক প্রতিবাদের জন্ম দেয়। সেইজন্য রাষ্ট্রবিরোধী লেখাগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং সরকারের প্রতি অসন্তুষ্টি কে দমন করার জন্য সকার ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাস করে। যদিও রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত আইন ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২৪এ তে ১৮৭০ সালে চালু করা হয়েছিল যেই কোনো সরকারবিরোধী কথাবার্তাকে দমন করার জন্য কিন্তু তা সত্ত্বেও ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বাকস্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর আরও বাধানিষেদ আনার জন্যে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা পাস করা হয়েছিল। লর্ড রিপন ভার্নালার প্রেস একট তা ১৮৮২ সালে প্রত্যাহার করেছিলেন যার ফলে ভার্নাকুলার কাগজগুলি সেই সময়কার আংলো ইন্ডিয়ান কাগজের মতো সমপরিমান স্বাধীনতার অধিকার অর্জন করবে।

১.৩.৮ অনুশীলনী

১. কোন গভর্নর জেনারেল চার্লস মেটকাফ এর উদারবাদী আইনকে সমর্থন করেছিলেন?

২. সিপাহী বিদ্রোহের পর জন অ্যাডামের গ্যাগিং অ্যাক্ট এর অনুরূপে কোন গভর্নর জেনারেল আইন পাস করেছিলেন?

৩. কোন ভাইসরয় ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আইনটি পাস করেন?

৪. প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম কি?

৫. সংবাদ কৌমুদী নামক খবরেরকাগজটি কে শুরু করেছিলেন?

১.৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

- হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম. যে নটরাজন. পাবলিকেশন্স ডিভিশন.
- এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম. মোহিত মৈত্র. ন্যাশনাল বুক এজেন্সী.
- জার্নালিজম ইন ইন্ডিয়া. রঙ্গস্বামী পার্থসারথি. স্টার্লিং পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড়
- হিস্ট্রি অফ জার্নালিজম: এন এনালিসিস. প্রশান্ত কে মাথুর. কনিষ্ক পাবলিশিং হাউস

মডিউল ১ ভারতে প্রেসের ইতিহাস

একক : ৪ ☐ স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীনতার পর থেকে প্রেসের ভূমিকা

গঠন

১.৪.১ উদ্দেশ্য

১.৪.২ প্রস্তাবনা

১.৪.৩ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম

১.৪.৩.১ লর্ড কার্জন ও অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট

১.৪.৩.২ বাংলার পার্টিশন

১.৪.৩.৩ বাল গঙ্গাধর তিলক

১.৪.৩.৪ প্রেস এবং কংগ্রেসের প্রথম সেশন

১.৪.৩.৫ বিপ্লবী আন্দোলন এবং সংবাদমাধ্যম

১.৪.৩.৬ গান্ধীজি এবং তার সংবাদপত্র

১.৪.৪ স্বাধীনতার পরে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম

১.৪.৪.১ প্রেস কমিশন

১.৪.৪.২ প্রেস কাউন্সিল

১.৪.৪.৩ ইমার্জেন্সির সময় ভারতীয় প্রেস

১.৪.৫ উপসংহার

১.৪.৬ সারাংশ

১.৪.৭ অনুশীলনী

১.৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.৪.১ উদ্দেশ্য

স্বাধীনতার আগে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, প্রেসের উপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা এবং কিছুটা শিথিলকরণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। প্রেসের মনোভাব কেমন হবে তা মূলত সেই সময় ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মূল্যবোধের উপর নির্ভর করত। ভারতের স্বাধীনতার পর সেই দৃষ্টি কিছুটা পাল্টেছে যদিও এখনো সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কতটা হবে তা কিছুটা হলেও ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মূল্যবোধ উপর নির্ভর করে। স্বাধীনতার আগে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা মূলত সেই সময়কার গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়দের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং স্বাধীনতার পরে, প্রেসের প্রতি মনোভাব মূলত ক্ষমতায় থাকা প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা ভাবনার উপরে নির্ভরশীল যদিও ভারত যেহুতু একটি গণতান্ত্রিক দেশ সেহুতু এখানকার সংবাদমাধ্যমেরা বাকস্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষমতার অধিকারী। এই একক এ আমরা ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার আগের ভূমিকা এবং ১৯৪৭ সালের পর তারা কি দিশা নিলো সেই বিষয় আলোচনা করবো।

১.৪.২ প্রস্তাবনা

প্রেস যা চতুর্থ এস্টেট নামেও পরিচিত, তার স্বাধীনতা, যে কোনো গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ তাদের সদস্যদের কাছ থেকে স্থানীয় বা জাতীয় বিষয়গুলিতে একটি সক্রিয় এবং বুদ্ধিমান অংশগ্রহণের দাবি করে। গণতান্ত্রিক সমাজ মানুষজনদের অংশগ্রহণ দাবি করে শুধুমাত্র নিখুঁত রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিতেই নয় বরংচ দেশের জটিল পরিস্থিতিগুলির প্রচেষ্টাতেও। সেই জন্য গণতান্ত্রিক সমাজের যে কোনো ঘটনার একটি স্পষ্ট এবং সত্য বিবরণ দরকার, ঘটনাগুলির পটভূমি এবং তাদের কারণ; ঘটনাগুলির জন্য আলোচনা ও সমালোচনার একটি ফোরাম এবং এমন একটি মাধ্যম দরকার যা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলিকে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের একটি জায়গা দেবে। এই সমস্ত চাহিদা পূর্ণ করার জন্য অনিবার্যভাবে সংবাদপত্র এবং সাময়িকীগুলি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১.৪.৩ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম

১.৪.৩.১ লর্ড কার্জন ও অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট

লর্ড কার্জন ১৮৯৯ সালে ভাইসরয় হিসেবে ভারতে এসেছিলেন। তিনি জনমতের তোয়াক্কা না করেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দমিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে উনি অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট নামক একটি আইন পাস করেছিলেন। এই আইনটি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় এক মারাত্মক বিপদ ডেকে এনেছিল এবং সেই জন্য এই আইনটি তীব্র নিন্দার সুম্মুখীন হয়েছিল ভারতীয় সংবাদপত্র এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রেস উভয়ের দ্বারা।

১.৪.৩.২ বাংলার পার্টিশন

জনমত বিবেচনা না করে লর্ড কার্জন বাংলার মতো একটি বৃহত প্রদেশের প্রশাসনের উন্নতির অজুহাতে আরেকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেটি ছিল ১৯০৫ সালে বাংলার পার্টিশন। এর বিরুদ্ধে বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল। লোকজনেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বিভাজন করার কারণ মূলত বাংলার জাতীয় চেতনা দুর্বল করার একটি চেষ্টা ছিল। বাংলার বিভাজনের আন্দোলনের সময় ব্রিটিশদের দমনমূলক পদক্ষেপের বিরোধিতা করার জন্য বিপ্লবী এবং তাদের সাংবাদিকতার একটি উত্থান দেখা দিয়েছিলো। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষের ছোট ভাই ১৯০৬ সালে যুগান্তর নামক একটি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাঞ্জাবের লালা লাজপত রাই পাঞ্জাবী নামে একটি সংবাদপত্র শুরু করেছিলেন, বাংলার বিভাজনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও প্রখর করার জন্য এই সংবাদপত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অরবিন্দ ঘোষ তার কাগজ বন্দেমাতরমে তার ব্রিটিশ বিরোধী লেখার জন্য ব্রিটিশদের বিরূপ চোখে পড়েছিলেন।

১.৪.৩.৩ বাল গঙ্গাধর তিলক

বাল গঙ্গাধর তিলক তার মারাঠি সাপ্তাহিক, কেশরী ১ জানুয়ারী, ১৮৮১ সালে শুরু করেছিলেন। তিনি, আগরকর এবং চিপলুঙ্কার সহ ইংরেজিতে মারাঠা নামক আরেকটি সাপ্তাহিক জার্নাল শুরু করেছিলেন। দ্য ডেকান স্টারের সম্পাদক, মহাদেব বল্লাল নামজোশীও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর কাগজটি ও মারাঠার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তিলকের কাগজগুলি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা

ছবি সৌজন্যে- Wikipedia

নেয়। তারা বাংলার পার্টিশন বিরোধী আন্দোলনকে একটি জাতীয় ইস্যু হিসেবে জনসমক্ষে এনেছিলেন। ১৯০৮ সালে তিলক সেডিশন অর্ডিন্যান্স এর বিরোধিতা করেছিলেন। তার ও আগারকার এর ব্রিটিশ বিরোধী লেখার জন্য তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। পরে তিলককে তাকে ছয় বছরের জন্য দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

১.৪.৩.৪ প্রেস এবং কংগ্রেসের প্রথম সেশন

প্রেস এবং কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সম্পাদকরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের সময় বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এই শ্রদ্ধার পরিমাপটি বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে, ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে যারা প্রথম সারির আসন দখল করেছিল তাদের মধ্যে ভারতীয় সংবাদপত্রের কিছু সম্পাদকও ছিলেন। এই অধিবেশনটিতে প্রথম রেসল্যুশনটি দ্য হিন্দু-র সম্পাদক জি. সুব্রামণ্য আইয়ার করেছিলেন। এই রেজুলেশনে দাবি করা হয়েছিল যে ভারতীয় প্রশাসনের কার্যকারিতা অনুসন্ধানের জন্য সরকারের উচিত একটি কমিটি নিয়োগ করা।

সেই সময় অনেক কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন যারা বিভিন্ন কাগজের সম্পাদক ছিলেন বা কোনো সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে, বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ফিরোজশাহ মেহতা, যিনি বম্বে ক্রনিকল শুরু করেছিলেন এবং পন্ডিত মদন মোহন মালাভিয়া, যিনি দৈনিক কাগজ, হিন্দুস্তানের সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি এলাহাবাদ থেকে লিডার নামক কাগজ প্রকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন। মতিলাল নেহরু ছিলেন লিডার কাগজের পরিচালনা পর্ষদের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন। লালা লাজপত রায় তিনটি জার্নালের প্রকাশনাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন -পাঞ্জাবী, বন্দেমাতরাম এবং লাহোর থেকে প্রকাশিত পিপল। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে, গান্ধীজি ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন প্রকাশ করেছিলেন এবং ভারতে ফিরে আসার পরে উনি ইয়ং ইন্ডিয়া, নবজীবন, হরিজন, হরিজন সেবক এবং হরিজন বান্ধুর প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বোস এবং সি আর দাস সাংবাদিক ছিলেন না তবে তারা ফরোয়ার্ড এবং অ্যাডভান্সের মতো কাগজপত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এই কাগজগুলি পরবর্তীকালে জাতীয় মর্যাদা লাভ করে। জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল হেরাল্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১.৪.৩.৫ বিপ্লবী আন্দোলন এবং সংবাদমাধ্যম

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন বন্দুক এবং বোমা দিয়ে শুরু হয়নি বরংচ এটি সংবাদপত্রের প্রকাশের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করা যাক যুগান্তর সংবাদপত্রের। এই সংবাদপত্রটি বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অভিনাশ ভট্টাচার্য এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতা শহরে ১৯০৬ সালে শুরু করেছিলেন। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এই সংবাদপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

যুগান্তরর পরে, বন্দেমাতরম কাগজটি স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই জার্নালটি সুবোধ চন্দ্র মালিক, সি. আর. দাস এবং বিপিন চন্দ্র পাল ৬ আগস্ট, ১৯০৬ সালে শুরু করেছিলেন। এই কাগজের

সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ, সন্ধ্যা কাগজের সম্পাদক বি উপাধ্যায় এবং যুগান্তর কাগজের সম্পাদক বি. এন. দত্তকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

লালা হরদয়াল ঘদর নামক একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। এক বছরের মধ্যে এই জার্নালের কয়েক মিলিয়ন অনুলিপি হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠি এবং ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে ভারতীয়রা বসবাস করতো সেখানে পাঠানো হয়েছিল। শুরুতে জাণালের অনুলিপিগুলি বিদেশি কাপড়ের পার্সেলগুলিতে গোপনে দিল্লিতে পাঠানো হতো। তাদের আরেকটি উদ্দেশ্যে ছিল গোপনে প্রিন্টিং প্রেস ভারতে পাচার করারও। কিন্তু এরপরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় যার ফলে বিদেশ থেকে প্রিন্টিং প্রেসের আমদানি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। লালা হরদয়ালকে আমেরিকাতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে তাকে ভারতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তাঁর অন্যতম অনুসারী পণ্ডিত রামচন্দ্র হিন্দুস্তান গদর নামক একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেছিলেন।

ভারতে এমন একটিও রাজ্য নেই যে স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণকে সমর্থন করার জন্য কোনও জার্নাল বা পত্রিকা প্রকাশ করেনি। এ. জি. হর্নিমান বম্বে ক্রনিকলকে জঙ্গি জাতীয়তাবাদি প্রচারের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নিজে যে সভাগুলিতে সত্যগ্রহের পরিকল্পনা করা হতো তাতে অংশ নিতেন। তিনি তার কাগজে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্পষ্ট বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন যার জন্য তাঁর কাগজের একজন সংবাদদাতা, গোভারধন দাসকে সামরিক আদালত তিন বছরের কারাদণ্ডে দন্ডিত করেছিল। হর্নিমানকেও গ্রেপ্তার করে অসুস্থ থাকাকালিনই লন্ডনে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

১৯০৫ সালে শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা লন্ডন থেকে ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট নামক জার্নালের প্রকাশ শুরু করেছিলেন। এটি লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট প্রকাশ করত। ১৯০৯ সালে এই জার্নালের দু"জন মুদ্রককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা পরে প্যারিসে গিয়ে জার্নালটির প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। পরে তাকে জেনেভা চলে যেতে হয়েছিল। তিনি আরও দুই বা তিন বছরের জন্য সেখান থেকে জার্নালটি বের করেছিলেন।

অ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজে থাকাকালীন কমনওয়েলথ নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বার করেন ১৯১৪ সালে। সেই বছরেরই জুন মাসে তিনি মাদ্রাজ স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রটিকে কিনে নেন এবং তার নাম নিউ ইন্ডিয়া রাখেন। এরপরে এই সংবাদপত্রটি ভারতের স্বাধীনতার বাণী প্রচারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে ওঠে। তিনি ভারতের এই স্বাধীনতার নাম রাখলেন 'হোম রুল' রাখেন। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সভাপতি করা হয়।

১.৪.৩.৬ গান্ধীজি এবং তার সংবাদপত্র

গান্ধীজি সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি যে সাপ্তাহিকিগুলির সম্পাদনা করেছিলেন তা সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা সাপ্তাহিকি। তিনি তার সংবাদপত্রে কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেননি। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকাতে থাকাকালীন যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, এইখানে উনি ১৯০৪ সালে "ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন" সংবাদপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং ইংরেজী, তামিল ও গুজরাতি ভাষায় তার প্রকাশনা করেছিলেন। "ইয়ং ইন্ডিয়া" এবং "হরিজন" সমস্ত বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশের একটি শক্তিশালী বাহনে পরিণত হয়েছিল। উনি তার কাগজে সব বিষয় সম্বন্ধেই লিখতেন। উনি সরল ও স্পষ্টভাবে কিন্তু আবেগ এবং ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে লিখেছিলেন। তার মতে একটি পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষজনের অনুভূতি বোঝা এবং তাকে প্রকাশ করা; তা ছাড়াও মানুষের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু পছন্দসই অনুভূতি জাগ্রত করা এবং তৃতীয়টি হলো নির্ভীকভাবে

সামাজিক অপূর্ণতা প্রকাশ করা। “ইয়ং ইন্ডিয়া” এবং “নবজীবন” নামক দুটি জার্নালকে উনি তাঁর মতামতকে উজ্জীবিত করতে এবং সত্যাগ্রহে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে গান্ধীজী যথাক্রমে ইংরেজী, গুজরাটি এবং হিন্দিতে “হরিজন”, “হরিজনবন্ধু”, “হরিজনসেবক” শুরু করেছিলেন। এই সংবাদপত্রগুলি ছিল গ্রামাঞ্চলে অস্পৃশ্যতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর লড়ার হাতিয়ার।

My Mouth is Gagged

HARIJAN

MAHADEV DESAI

ছবি সৌজন্যে-dnaindia.com

১.৪.৪ স্বাধীনতার পরে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম

স্বাধীনতা অর্জনের সাথে-সাথে গণতন্ত্রের মূলনীতি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জনগণ সার্বভৌমত্ব পায়। জনগণ ও শাসকদের মধ্যেকার বিদ্বেষের অবসান ঘটে এবং সরকার ও প্রেসের সম্পর্কের নতুন অধ্যায় চালু হয়। ভারতীয় প্রেসের অবিরাম দাবিতে সরকার ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে একটি প্রেস আইন তদন্তকরি কমিটি নিয়োগ করে এবং তাকে প্রেস আইনগুলির অনুসন্ধান করা এবং সেগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রস্তাব আনার দায়িত্ব দেয়। এই কমিটি তার প্রতিবেদন ১৯৪৮ সালের মে মাসে জমা দেয়। তার সুপারিশগুলির মধ্যে ছিলো কিছু আইন যেমন ইন্ডিয়ান প্রেস ইমার্জেন্সি পোয়ার্স একট ১৯৩১ ও স্টেটস প্রটেকশন এক্ট ১৯৩৪ কে প্রত্যাহার করা এবং অন্য আইনগুলির মধ্যে পরিবর্তন আনা। একই সাথে কমিটি প্রস্তাব দেয় যে প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রেস পরামর্শদাতাদের বৃহত্তর ব্যবহার এবং স্থানীয় প্রেস পরামর্শদাতা কমিটির পরামর্শ ছাড়া কোনো সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া।

ভারতের খসড়া সংবিধানে বাকস্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু আমেরিকান এবং রাশিয়ান সংবিধানের মতো সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। অনুমান করা হয়েছিল যে প্রেসের স্বাধীনতা, যেটি বৃহত্তর মত প্রকাশের একটি দিক তার স্বাধীনতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধান দ্বারা রক্ষিত ছিল। ডঃ আম্বেদকর, তখনকার আইনমন্ত্রী, বলেছিলেন যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাঁড়িয়ে আছে সংবিধানের ব্যক্তির বাকস্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর এবং সেই জন্য প্রেসের নাগরিকের চেয়ে বেশি অধিকার দাবি করা উচিত নয়। শ্রীরাজাগোপালাচারী একটি প্রেস পার্টিতে এই বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে প্রেস কে সংবিধানে উল্লেখ করে সীমাবদ্ধ করা মানে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় প্রেস বিশাল পরিমাণে স্বাধীনতা উপভোগ করেছিল কারণ পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বাস করতেন যে গণতান্ত্রিক স্থাপনের সফল কার্যকারিতার জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তাঁর কাছে, সমালোচনা এমন একটি উপায় ছিল যার মাধ্যমে সরকারের কাজকর্মের উন্নতি হতে পারে এবং তাই তিনি সমালোচনাকে উতাহিত করতেন। যদিও নেহেরু উদার ছিলেন এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি বাধ্য হয়েছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের পরে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিরোধকারী আইন কার্যকর করার জন্য যাতে তিনি প্রেসে সাম্প্রদায়িক লেখাকে রুখতে পারেন। তিনি সেই সময় দেখেছিলেন যে প্রেস সাম্প্রদায়িক ভাবে ভারতের বিভাজনের পর সৃষ্টি হওয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে আরো কঠিন করে দিচ্ছিলো। সেই জন্য ২৩ শে অক্টোবর, ১৯৫১ তিনি একটি নতুন আইন 'প্রেস এন্ড অব্জেকশনেবল ম্যাটার্স এক্ট' নামে একটি আইন পাস করেন। আইনটির ব্রিটিশদের সময় ১৯০৮, ১৯১০, ১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালে পাস হওয়া আইনেই অনুরূপ ছিল। এই আইনটি নেহেরুর প্রেসের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে খবরের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করা, তার প্রতি উদ্বেগের প্রতিফলন ছিল। এই আইন এর মাধ্যমে আপত্তিকর বিষয়গুলির মধ্যে ছিল কোনও শব্দ, চিহ্ন বা দৃশ্যমান অন্তর্ভুক্ত উপস্থাপনা যা কোনো ব্যক্তিকে হিংস্রতার প্রতি উতাহিত করতে পারে অথবা সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করতে পারে।

এই আইনটি পাস হওয়ায় সারা ভারত জুড়ে সম্পাদকরা এবং সাংবাদিকরা প্রতিবাদে নেমেছিল। দি অল ইন্ডিয়া নিউজপেপার্স এডিটরস কনফারেন্স, দি ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ও দি ল্যাঙ্গুয়েজে নিউজপেপারস এসোসিয়েশন এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে অনেক প্রস্তাব এনেছিলেন। সুতরাং, যদিও নেহেরু ১৯৫১ এ এই আইনটি পাস করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটি জোর দিয়ে প্রয়োগ করেননি। শেষে সাংবাদিকদের শান্ত করার জন্য, নেহেরু, ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে প্রেস কমিশন গঠনের ঘোষণা করেন এবং এই কমিশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়োগ করেছিলেন যাতে তারা ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারেন। দ্য প্রেস (অব্জেকশনেবল ম্যাটার্স) আইনটিকে ১৯৫৬ সালে বাতিল করে দেওয়া হয়।

১.৪.৪.১ প্রেস কমিশন

প্রথমবারের জন্য আমাদের প্রেসের কাঠামো এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ তদন্ত ১৯৫২-৫৪ সালে প্রেস কমিশন দ্বারা করা হয়েছিল। কমিশন লক্ষ করলো যে ভারতে সংবাদপত্রের মালিকানা কিছু গোষ্ঠীর হাতে এবং এই প্রবণতা আরও বাড়লে প্রেস এর স্বাধীনতায় বিপদ ডেকে আনতে পারে। প্রেসের বিকাশের জন্য কমিশনের অনেকগুলি সুপারিশের মধ্যে একটি ছিল প্রেস রেজিস্ট্রার এর নিয়োগ। প্রেসের স্ব-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্রেস কাউন্সিল স্থাপন করার কথাও বলা হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রেস কমিশন তার ১৯৮২ সালের প্রতিবেদনে প্রেসকে অন্যান্য শিল্পের থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রেস কমিশন সমাজে ধারণার বৃহত্তর বিস্তার ও বিকিরণের কথার উপরেও গুরুত্ব দিয়েছিলো। কমিশন স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিল যে সাংবাদিকতা কেবল একটি শিল্প নয় বরংচ জনসেবা।

কমিশনের অন্যতম প্রধান সুপারিশ ছিল একটি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কমিশন (এনডিসি) গঠন করা যা ভারতীয় প্রেসের উন্নতিতে কার্যকর হবে। এনডিসি বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্রগুলির জন্য পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করবে যাতে তাদের মুদ্রণ ও অন্যান্য প্রযুক্তি বিকশিত হতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল খবরের সঙ্গে বিজ্ঞাপনএর অনুপাত। এই ক্ষেত্রে বড়ো সংবাদপত্রগুলি ৬০:৪০ হারেব্রে মাঝারি সংবাদপত্রগুলি ৫০:৫০ হারে এবং ছোটগুলি ৪০:৬০ হারে, বিজ্ঞাপন চাপাতে পারবে এই প্রস্তাব প্রেস কমিশন রেখেছিলো।

এখন, আমাদের কাছে একটি বৃহত এবং উন্নত প্রেস রয়েছে। প্রায় ১,০৫,৪৪৩ টি পত্রিকা ও সাময়িকী ভারতবর্ষে রয়েছে যা ৯২টি ভাষা এবং উপভাষায় প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ কাগজপত্র মুদ্রণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

১.৪.৪.২ প্রেস কাউন্সিল

প্রথম প্রেস কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী একটি প্রেস কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কাউন্সিলের জন্য দৃশ্যমান লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল: 'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করা', 'প্রেসের পক্ষ থেকে জনসাধারণের রুচির উচ্চমানের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা এবং নাগরিকত্বের অধিকার এবং দায়িত্ব উভয় সম্পর্কে যথাযথ বোধ জাগানো' এবং 'সাংবাদিকতার পেশায় নিযুক্ত সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং জনসেবা বোধ বৃদ্ধিতে উতাহিত করা।' কমিশন, আইনী ভিত্তিতে কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিল এবং বলেছিলো যে কাউন্সিলের তদন্ত করার আইনি ক্ষমতা থাকবে।

ছবি সৌজন্যে-Nationalheraldindia.com

প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া সর্বপ্রথম ১৯৬৬ সালের ৪ জুলাই গঠিত হয় একটি স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ, অর্ধ বিচার বিভাগীয় সংস্থা হিসাবে এবং সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি, জে আর মুধোলকরকে তার সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৬৫, কাউন্সিলের নিম্নোক্ত কাজকর্মের বিষয়গুলি তালিকাভুক্ত করেছে:

- সংবাদপত্রকে তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে;
- উচ্চ পেশাদার মান অনুযায়ী সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি তৈরি করা;
- সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের পক্ষে জনগণের রুচির উচ্চমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নাগরিকত্বের অধিকার এবং দায়িত্ব উভয়ই বোধগম্য করানো;
- সাংবাদিকতার পেশায় নিযুক্ত সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবা বৃদ্ধির উৎসাহ জোগানো;
- জনস্বার্থ ও গুরুত্বের সংবাদ সরবরাহ ও প্রচারকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এমন কোনও পরিণতির দিকে নজর রাখা;
- বিদেশী উৎস থেকে ভারতের যে কোনও সংবাদপত্র বা নিউজ এজেন্সির প্রাপ্ত সহায়তার বিষয়টি পর্যালোচনা করা যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরকে তা করার জন্য নির্দেশ করে।

১৯৬৫ সালের আইনের অধীনে গঠিত কাউন্সিলটি ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস অবধি কার্যকর ছিল। অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সময়, আইনটি বাতিল করা হয়েছিল এবং সেই মতো কাউন্সিলটিও বাতিল হয়ে যায়। কাউন্সিল

প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নতুন আইন ১৯৭৮ সালে পাস করা হয় এবং ভারতে প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষা এবং প্রেসের মান বজায় রাখা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৯ সালে এই সংস্থাটি ফের গঠন করা হয়।

১.৪.৪.৩ ইমার্জেন্সির সময় ভারতীয় প্রেস

অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা ২৬ শে জুন, ১৯৭৫ সালে করা হয়। এই জরুরি অবস্থা ১৯ মাস পর্যন্ত চলেছিল এবং এই সময়টাকে ভারতীয় প্রেসের ইতিহাসের অন্ধকারতম কাল হিসাবে মনে করা হয়। সেই একই দিনে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে, সরকার 'সেন্ট্রাল সেন্সরশিপ অর্ডার' এবং 'গাইডলাইনস ফর দি প্রেস ইন দি প্রেসেন্ট ইমার্জেন্সি' জারি করে। সেন্ট্রাল সেন্সরশিপ অর্ডার সমস্ত মুদ্রক, প্রকাশক এবং সম্পাদককে সম্বোধন করে, এবং যেকোনো সংবাদ, মন্তব্য, গুজব ও অন্য কোনও দস্তাবেজ যা সরকারের কোনো কাজের সাথে যুক্ত তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং প্রকাশের আগে সমস্ত সাময়িকী ও পত্রিকাগুলি সরকার দ্বারা অনুমোদিত কর্মকর্তা দ্বারা যাচাইয়ের জন্য প্রথমে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করে। সরকারের প্রধান সেন্সরকে পুরো সেন্সরশিপ অপারেশন তদারকি এবং পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১১ ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ সালের আইনসভার অনুমোদনক্রমে, কংগ্রেস সরকার প্রিভেনশন অফ পাবলিকেশন অফ অব্জেকশনেবল ম্যাটার্স এক্ট পাস করেছিল। এই আইন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৯০৮, ১৯১০, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২ এবং ১৯৫১ এর প্রেস দমনের সমস্ত বিধান। এই আইনের সমস্ত বিধান ভারতের সমস্ত অঞ্চলগুলিতে কার্যকর করা হয়েছিল ৮ ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ সাল থেকে। এই আইনটি কেন্দ্রীয় সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়েছিলো যেই কোনো প্রকাশনা যা বিদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার ক্ষতি করে, পাবলিক অর্ডার, শালীনতা, নৈতিকতার খণ্ডন করতে পারে বা প্রকাশনা যা আইন লঙ্ঘন করাকে প্ররোচিত করতে পারে তাকে নিষিদ্ধ করা হবে। এটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়েছিল প্রেসকে সতর্ক করা, তাদের কাছ থেকে সিকিউরিটি ডিপোজিট দাবী করা অথবা তাদের সিকিউরিটি ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত করা সুরক্ষা জালিয়াতি ঘোষণা করা এবং যেই মুদ্রণকার বা প্রকাশকেরা আপত্তিজনক বিষয়গুলি ছাপছেন তাদের কাছ থেকে আরো সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায় করা। এটি কেন্দ্রীয় সরকার বা সক্ষম কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়েছিলো মুদ্রণ বন্ধ বা বাজেয়াপ্ত করার যদি তারা প্রয়োজনীয় ডিপোজিট না দিতে পারে, আপত্তিজনক লেখালেখিকে বাজেয়াপ্ত করা এবং যারা নিয়ম লঙ্ঘন করবেন তাদের উপর জরিমানা লাগু কর ওহাব তাদেরকে জেলে পাঠানো। শুল্কভবনের অফিসারদের আপত্তিজনক উপকরণ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং রাজ্য পুলিশ আধিকারিকদের অননুমোদিত সংবাদপত্র এবং নিউজ-শিট বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। মহানগরের ম্যাজিস্ট্রেটদের, প্রধান বিচারপতি ম্যাজিস্ট্রেটদের এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটদের মুদ্রণ প্রেসগুলির ভিতরে ঢুকে সেইটা বাজেয়াপ্ত করার পরোয়ানা জারি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

কমপক্ষে তিন রকমের কার্যপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল খবরের কাগজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য: (১) সরকারী বিজ্ঞাপনের বন্টন ; (২) সংবাদ সংস্থাগুলির একত্রীকরণ এবং (৩) সংবাদপত্র প্রকাশকদের, সাংবাদিকদের এবং স্বতন্ত্র শেয়ারহোল্ডারদের উপর ভয়-উদ্দীপনার কৌশল ব্যবহার। দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও দি স্টেটসম্যান এর মতো কাগজগুলি, যারা সরকারি সেন্সরশিপ এর বিরোধিতা করেছিল, তাদের কাছ থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আবার চারটি ভারতীয় নিউস এজেন্সিদেরকে একত্রিত করে দেওয়া হয় যাতে এক জায়গা থেকে সমস্ত খবরকে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ভয়-উদ্দীপনার কৌশল ব্যবহারে কাশক, সম্পাদক, সংবাদদাতা ও শেয়ারহোল্ডারদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভয় দেখানো হয়েছিল যেমন মিথ্যে ভাবে করের বকেয়া দেখানো, নিউজপ্রিন্ট

কোটা কমিয়ে দেওয়া, প্রকাশকদের ও তাদের পরিবারদের কারাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া, তাদের ছাপাখানা বন্ধ করে দেওয়া প্রভৃতি কার্যক্রম সরকার করেছিল।

যখন জনতা পার্টির সরকার ভারতের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আসলো এবং মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি তিনটি স্বতন্ত্র পদক্ষেপের দিকে মানুষের দৃষ্টিপাত করেছিলেন যাতে ভারতীয় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা যায়। এগুলি ছিল: (১) অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে গণমাধ্যমের অপব্যবহার অধ্যয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা (২) অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শন (টেলিভিশন) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার বিষয়টা দেখার জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রূপ প্রতিষ্ঠা করা এবং (৩) একটি কমিটি স্থাপন করা যা সেই সময় বিদ্যমান থাকা সংবাদ সংস্থা (সমাচার) এর পুনর্গঠনের সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন করবে।

১.৪.৫ উপসংহার

ভারতবর্ষে প্রতিদিন ১১০ মিলিয়ন কপির ও বেশি সংবাদপত্র বিক্রি হয় যেই কারণে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংবাদপত্রের বাজার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সমীর জৈন বি সি সি এল এর কর্মকর্তা হওয়ার পর সাধারণ বিপণন নীতি এবং ভাল ব্যবসায়িক বোধ ব্যবহার করে তার লস এ পরিচালিত প্রকাশনা সংস্থাকে প্রফিট এর মুখ দেখিয়েছিলেন। মার্কেট উদারীকরনের পরবর্তী সময় সংবাদমাধ্যমের কাছে অনেক সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ১৯৯২ সালে, উভয় নিউজপ্রিন্ট এবং মুদ্রণ যন্ত্রপাতিকে ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের আওতায় রাখা হয় যার ফলে তার আমদানি সহজ হয়ে যায়। ১৯৯০ এর দশকে, বিভিন্ন সংস্থা ইচ্ছা প্রকাশ করে ভারতে বিদেশী মুদ্রণ সংস্থাদের নিয়ে আসার এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার কিন্তু সরকার সেই ইচ্ছে পূরণ হতে দেয়নি। অবশেষে, ২০০২ সালের জুনে মন্ত্রিসভা একটি প্রস্তাব পাস করে যার ফলে প্রিন্টে ২৬ শতাংশ এফ ডি আই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) এর অনুমতি দেওয়া হয়। এটি ২০০৫ এ সংশোধন করা হয়েছিল অনুমতি দেওয়ার জন্য এফ আই আই (ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট) এবং আরও সংশোধন ২০০৬ সালের মার্চ মাসে করা হয়েছিল। এখনকার মিডিয়া সংস্থাগুলির কাজ বিষয়বস্তু তৈরি করা; বাকি ব্যাপারটা প্যাকেজিং এবং বিপণন এর মাধ্যমে হয়। বিষয়বস্তু ভাল হলে, ব্যবসা সাধারণত ভাল চলে। ভারতে আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রগুলি মানুষজনদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। হিন্দি, বাংলা, মালায়ালাম এবং অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্রগুলির বিকাশ অব্যাহত রয়েছে এবং সংবাদপত্রগুলো একেঅপরের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করছে যাতে ভারতের বিভিন্ন স্তরের শহরগুলিতে তারা জায়গা করে নিতে পারে। আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রের বৃদ্ধি প্রমাণ করেছে মানুষজনদের আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রের চাহিদা। আজকের অনেক শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়ে আমাদের কাছে এখনো রয়েছে। অন্যান্য খবরের কাগজের মধ্যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে আমাদেরকে খবর সরবরাহ করে চলেছে, সেই কাগজগুলি হলো, টাইমস অফ ইন্ডিয়া (টি ও আই), মুম্বাই সমাচার, মলয়ালা মনোরমা, আনন্দবাজার পত্রিকা (এ বি পি) এবং দ্য হিন্দু।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠনে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজা রামমোহন রায় থেকে কেশব চন্দ্র সেন, গোখলে, তিলক, ফিরোজশাহ মেহতা, সুভাষ চন্দ্র বসু, সি আর দাস, দাদাভাই নওরোজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সি ওয়াই চিন্তামণি, মতি লাল নেহরু, মদন মোহন মালাভিয়া, এম.কে. গান্ধী এবং জওহরলাল নেহেরুর মতো নেতারা সংবাদমাধ্যমকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী জনমত সংহত করা এবং জাগ্রত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তারা সরকারের নীতিগুলির সমালোচনা করেছিল এবং

জনসাধারণকে রাজনৈতিক সমস্যাগুলি প্রেসের মাধ্যমে বোঝানোর জন্য শিক্ষিত করল। তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সংগ্রামের পদ্ধতি জনগণদের জানিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। এই জন্য সেই সময়ে দৈনিক এবং সাময়িকী উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেল। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রেসের অবদান মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

নতুন শতাব্দীর আগমনে সংবাদপত্রের সংখ্যা আরো বেড়েছিল বিশেষত ভার্নাকুলার প্রেস যা জাতীয় চেতনা জাগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলো সর্বদা সরকারী ব্যবস্থা এবং নীতি সমর্থন করে চলেছিল যার ফলে ভারতীয় এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদমাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য আরো বেশি জোরদার রূপ নিলো। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে কথা বলছিলো আবার অন্যদিকে আংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলো সরকারের পক্ষে কথা বলা চালু রেখেছিলো। সরকারও সেই জন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ার কাগজপত্রের পক্ষে ছিল এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের বিরোধিতা করেছিল।

১.৪.৬ সারাংশ

গত দুই শতাব্দীর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে ১৭৮০ সাল থেকে আজ অব্দি ভারত সরকার সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হ্রাস আস্তে অনেকরকমের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার আগে অনেক গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়রা প্রেসের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য অনেক রকমের আইন পাস করেছিলেন। স্বাধীনতার পরেও, প্রেস এর উপর কিছু বিধিনিষেধ অব্যাহত থাকে।

স্বাধীনতা আগে ও পরে, সর্বদাই ,সরকার ও প্রেসের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ও লড়াই আমরা দেখে আসছি। অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়েও ভারতে প্রেসের সংখ্যার পাশাপাশি তার প্রভাব ও দিনে দিনে বেড়েছে। এর কারণ হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রথম থেকেই প্রেস জনমত তৈরী করতে সক্ষম ছিল এবং ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোও প্রেসকে নিজের অধিকার ব্যবহার করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

১.৪.৭ অনুশীলনী

১. গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থাকাকালীন কোন সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন ?

২. কোন সালে ভারতে অব্যন্তরীন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় ?

৩. প্রেস কাউন্সিলের গঠন কোন সালে হয়েছিল ?

৪. যুগান্তর নামক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন ?

৫. অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টটি কোন ভাইসরয় পাস করেছিল ?

১.৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

- দি প্রেস ইন ইন্ডিয়া: পার্সপেক্টিভ এন্ড রেলেভেন্স। এস.কে.পাধ্যা, এন. আর. সাহু। কনিষ্ক পাবলিশার্স এন্ড ডিস্ট্রিবিউটর্স।

- প্রেস এন্ড সোশ্যাল চেঞ্জ। জি. পি. পাণ্ডে। মানাক পাবলিকেশন লিমিটেড।
- দি প্রেস ইন ইন্ডিয়া। এম. চালাপাতি রাও। এলিয়েড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- জার্নালিজম ইন ইন্ডিয়া :ফ্রম টি অর্লিয়েস্ট টাইম টু দি প্রেসেন্ট ডে। রঙ্গস্বামী পার্থসারথি। স্টার্লিং পাবলিশার্স।
- মাস মিডিয়া টুডে। সুবীর ঘোষ। প্রোফাইল পাবলিশার।
- সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত : ড: নন্দলাল ভট্টাচার্য। (লিপিকা)

মডিউল ২.১ সংবাদ সংস্থা

একক : ১ □ সংবাদসংস্থার বিকাশ Development of News Agency System

২.১.০ গঠন

২.১.১ উদ্দেশ্য

২.১.২ প্রস্তাবনা

২.১.৩ সংবাদসংস্থা এবং সাংবাদিকতা

২.১.৪ সংবাদ সংস্থার ইতিহাস

২.১.৫ পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি সংবাদসংস্থা

২.১.৬ এজেন্সি ফ্রান্স প্রেসে (AFP)

২.১.৭ রয়টার্স (Reuters)

২.১.৮ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP)

২.১.৯ সারাংশ

২.১.১০ অনুশীলনী

২.১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

২.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককে গণমাধ্যমের একটি বিশেষ দিক, সংবাদসংস্থা এবার সারা পৃথিটাতে এর কর্মপরিধি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এরা ফলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে প্রতিটি সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন কীভাবে বিশ্বের অপর প্রান্তে ঘটে যাওয়া সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে বিস্তারিত পেয়ে যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কোনও সংবাদ মাধ্যমের পক্ষেই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি শহরে নিজস্ব প্রতিনিধি রাখা সম্ভব নয়। এই কাজটি ঘরে নির্দিষ্ট কিছু সংবাদসংস্থা। বার্ষিক কিছু অর্থের বিনিময়ে সংবাদমাধ্যমগুলি সেই সংবাদসংস্থার গ্রাহক হয় এবং ফলে সংবাদ সংগ্রহে সুবিধা হয়। বস্তুটিই সাংবাদিকতায় পাঠ নিতে গেলে অবশ্যই সংবাদসংস্থায় কাজ শিখতে হবে। এই একদেয় মূল আলোচ্য বিষয় হল—

- সংবাদসংস্থা ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা
- বিশ্বের সংবাদ সংস্থায় ইতিহাস
- পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি সংবাদসংস্থা
- এজেন্সি ফ্রান্স প্রেসে

● রয়টার্স

● অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বা এপি

২.১.২ প্রস্তাবনা

সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে সংবাদসংস্থায় বিপুল প্রভাব। একমাত্র নামকরা সংবাদসংস্থায় বিপুল প্রভাব। একমাত্র নামকরা সংবাদসংস্থার প্রতিনিধিরাই পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তিক এলাকায় সংবাদ, নিজস্ব নেটওয়ার্ক এবং নিজস্ব প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরাসরি সংগ্রহ করে আনেন এবং সেটি পরদিন সংবাদপত্রে ছাপা হয়। এই এককে তাই সংবাদসংস্থার ইতিহাস, পৃথিবীর কয়েকটি নামকরা সংবাদসংস্থার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। জানা যাবে, পৃথিবীর কোন দেশে কোন সংবাদসংস্থা কাজ করছে।

২.১.৩ সংবাদসংস্থা এবং সাংবাদিকতা

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এবং সংবাদসংস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কারণ প্রতিটি সংবাদপত্রের নির্দিষ্ট কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে। কিন্তু সংবাদ সংস্থা হল এমন একটি সংস্থা, যাকে প্রতিটি সংবাদ অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করতে হয়। যে যে সংবাদমাধ্যম তার কাছ থেকে সংবাদ কিনছে, প্রত্যেকে একই সংবাদ পায়। পরবর্তীকালে প্রতিটি সংবাদ মাধ্যম নিজের মত করে সেই সংবাদ পরিবেশন করে। এক কথায় সংবাদসংস্থা হল সেই ধরণের সংবাদ বিক্রির এজেন্সি, যারা নিজের সাংবাদিকদের মাধ্যমে বা চুক্তিভিত্তিক অন্য সংবাদসংস্থা থেকে খবর সংগ্রহ করে এবং বার্ষিক গ্রাহক মূল্যের বিনিময়ে প্রতিটি সংবাদ মাধ্যমে সেই খবর প্রেরণ করে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে এখন প্রায় প্রতিটি সংবাদসংস্থা খবরের সঙ্গে ছবিও বিক্রি করে থাকে। পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদসংস্থা হল—রয়টার্স, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), এজেন্সে-ফ্রান্স-প্রেসে (এ এফপি) ইত্যাদি। প্রতিযোগিতার বাজারে একটি সংবাদসংস্থায় টিকে থাকায় মূল মন্ত্র হল—বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সত্য তথ্য পরিবেশন। ভারতের ২টি উল্লেখযোগ্য সংবাদসংস্থা হল পিটিআই (PTI) এবার ইউ এন আই (UNI)।

২.১.৪ সংবাদ সংস্থার ইতিহাস

সংবাদসংস্থার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, ফ্রান্সে উনবিংশ শতকের শুরুতেই বেশ কিছু ছোট ছোট সংবাদসংস্থা ছিল। ফ্রান্সে উনবিংশ শতকের শুরুতেই বেশ কিছু ছোট ছোট সংবাদসংস্থা ছিল। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে বেশ কয়েকটি সংবাদসংস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৩৫ সালে ফ্রান্সে তৈরি হয় হাভাস এবং আমেরিকায় ১৮৪৬ সালে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস তার যাত্রা শুরু করে। এরপর জাভাসের প্রাক্তন বেশকিছু কর্মী ব্রিটেনে ১৮৫১ সালে তৈরি করে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদসংস্থা রয়টার্স। জার্মানিতে ১৮৪৯ সালে তৈরি হয় উলফ, সংবাদসংস্থা। এই ৪টি সংবাদসংস্থাই পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য যাদের সম্পর্কে আমরা পরবর্তীকালে জানব।

১৮৫০ সালে টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংবাদসংস্থার ভূমিকা আরও বেশি প্রখর হয়ে ওঠে। ১৮৬৯ সালের ব্রিটিশ টেলিগ্রাফ আইন এবং ১৮৭৮ সালের ফ্রান্সের টেলিগ্রাফ আইন সংবাদসংস্থার প্রসারে অগ্রণ্য ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ ভারতে বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই শুরু হয় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া (১৯০৫)-র যাত্রা—যা পরে স্বাধীন ভারতে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—ভারতের বর্তমানে দুটি নামকরা নিউজ এজেন্সি পিটিআই এবং ইউ এন আই-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল দুই বাঙালির হাত ধরে। এদের সম্পর্কেও বারে বিস্তারিত জানতে পারব।

২.১.৫ পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি সংবাদসংস্থা

পুরো নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	দেশ
● এজেন্সি ফ্রান্স প্রেসে	AFP	ফ্রান্স
● অ্যাগেনপার্ল	—	ইতালি
● আলক্যিরিয়া প্রেস সার্ভিস	APS	আলজিরিয়া
● অল হেড লাইনস নিউজ	AHN	আমেরিকা
● এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল	ANI	ভারত
● অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস	AP	আমেরিকা
● অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সার্ভিস	APS	পাকিস্তান
● অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস	AAP	অস্ট্রেলিয়া
● অস্ট্রিয়া প্রেসে অ্যাজেন্টুর	APA	অস্ট্রিয়া
● বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	BSS	বাংলাদেশ
● বুলগেরিয়ান টেলিগ্রাম এজেন্সি	BTA	বুলগেরিয়া
● চায়না নিউজ সার্ভিস	CNS	চীন
● ডয়সে প্রেসে অ্যাজেন্টুর	DPA	জার্মানী
● ইউরোপিয়ান নিউজ এজেন্সি, বেলজিয়াম	ENAB	ইউরোপ
● ফার্স্ট নিউজ এজেন্সি	FNA	ইরান
● ইরানীয়ান স্টুডেন্টস নিউজ এজেন্সি	ISNA	ইরান
● কেনিয়া নিউজ এজেন্সি	KNA	কেনিয়া
● নিউজ এজেন্সি অব নাইজেরিয়া	NAN	নাইজেরিয়া
● পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল	PPI	পাকিস্তান
● প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া	PTI	ভারত
● রয়টার্স	GBR	ব্রিটেন
● রাশিয়ান নিউজ এজেন্সি	TASS	রাশিয়া
● সৌদি প্রেস এজেন্সি	SPA	সৌদি আরব
● ইউনাইটেড নিউজ অব ইণ্ডিয়া	UNI	ভারত

● জিনহুয়া নিউজ এজেন্সি	XINHUA	চীন
● ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশানাল	UPI	আমেরিকা
● ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ	UNB	বাংলাদেশ
● ভিয়েতনাম নিউজ এজেন্সি	TTXVN	ভিয়েতনাম
● সিরিয়ান আরব নিউজ এজেন্সি	SANA	সিরিয়া

২.১.৬ এজেন্সি ফ্রান্স প্রেসে (AFP)

এ এসপি হল পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো সংবাদ সংস্থা সেটি তৈরি হয়েছিল ফ্রান্সে। ১৮৩৫ সালে চার্লস লুই হাডাস যখন এটি প্রথম তৈরি করেন, তখন এর নাম ছিল হাডাস। পরবর্তীকালে এর নাম পরিবর্তিত হয় এবং এখান থেকেই দুজন সংবাদকর্মী, পল জুই রয়টার এবং বার্নার্ড উলফ, হাডাস থেকে বেরিয়ে এসে লণ্ডন এবং বার্লিনে দুটি পৃথক সংবাদ সংস্থা, রয়টার্স এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস তৈরি করেন। বর্তমানে এদ্রফপি-র সদর অফিস ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত হলেও সাউ প্রাজ্ঞের রাজধানী নিকোসিয়া, উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিও, হবে কবে এবং ওয়াশিংটন ডিসি—এই ৪টি শহুরে আঞ্চলিক অফিস এবং ১৫১টি দেশের ২০০টি শহুরে নিউজ ব্যুরো রয়েছে। ইংরাজি, ফরাসী, আরবি, পর্তুগীজ, স্প্যানিস এবং জার্মানি—এই ৬টি ভাষায় এএফপি-র সমস্ত ধরণের সংবাদ প্রেরণের পরিষেবা চালু রয়েছে।

১৯৪০ সালে জাতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনা ফ্রান্স দখল করে নিলে এই সংবাদসংস্থার নাম পরিবর্তিত হয়ে রাখা হয় ‘ফ্রেন্স ইনফর্মেশন অফিস’। পরবর্তীকালে ১৯৪৪ সালের ২০ আগস্ট সংযুক্ত বাহিনী প্যারিস পৌঁছলে, একদল সাংবাদিক প্রেস ইনফরমেশন অফিস দখল করে নেয় এবং সর্বপ্রথম এজেন্সি ফ্রান্স-প্রেসের সংবাদ সংস্থার নামে, এখান থেকে সংবাদ পরিবেশন শুরু হয়। ১৯৫৭ সালের ১০ জানুয়ারি ফ্রান্সের সংসদ এই সংবাদসংস্থাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। বলা যায়, সেই থেকে অফ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু বিখ্যাত সংবাদের ফার্স্ট এই সংবাদসংস্থা।

১৯৮২ সালে এই সংবাদসংস্থা সিদ্ধান্ত নেয়, সম্পাদকীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে এবং সেই ভাবনা থেকে ৫টি শহুরে আলাদা সংবাদের অফিস তৈরি হয়। প্রতিটি অফিসের নিজস্ব সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। সারা পৃথিবীতে উচ্চমানের সংবাদ পরিবেশনের জন্য ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে এএফপি ফাউন্ডেশন তৈরি হয়।

২.১.৭ রয়টার্স (Reuters)

পৃথিবীর অন্যতম নাম করা সংবাদ সংস্থা হল ব্রিটেনের রয়টার্স। ২০০৮ সাল পর্যন্ত এই সংবাদসংস্থা, রয়টার্স গ্রুপের অন্যতম একটি কোম্পানি হিসেবে যুক্ত থাকলেও সেই বছর থমসন রয়টার, এই সংবাদসংস্থাকে কিনে নেয়। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত থমসন রয়টার্স সংস্থায় অধীন সংবাদসংস্থা হিসেবে রয়টার্স কাজ করছে।

১৮৫১ সালে তৈরি হয় রয়টার্স সংবাদ সংস্থা। উদ্যোগী ছিলেন পল রয়টার। তিনি বার্লিনে একটি প্রকাশনা সংস্থায় কাজ করতেন এবং পরবর্তীকালে এ এফ পি-তে যোগ দেন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই তৈরি হয় রয়টার্স। প্রথম থেকেই সুনামের সঙ্গে কাজ করতে থাকে এই সংবাদ সংস্থা। লন্ডনের তৎকালীন প্রায় প্রতিটি বড় সংবাদপত্র সে সময় রয়টার্সের সংবাদ গ্রাহক হয়ে ওঠে। রয়টার্সের প্রথম গ্রাফে ১৮৫৮ সালে, লন্ডন মনিং অ্যাডভার্টাইজার সংবাদপত্র।

১৮৭২ সালে রয়টার্স প্রথম দেশের বাইরে, একেবারে পূর্বদিকে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় তাদের সংবাদসংস্থার অফিস খোলে। এই দুই বিস্তার সম্ভব হয়, কারণ মাটির ওপর দিয়ে ও সমুদ্রের নীচ দিয়ে টেলিগ্রাফ তার গিয়ে যাওয়ার প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়ে গেছে।

১৯১৬ সালে রয়টার্স সংবাদ সংস্থায় সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ ঘটে এবং রডরিক জোনস ও মার্ফ নেপিয়ের যৌথভাবে এই সংবাদসংস্থা কিনে নেন। নাম পাল্টে হয় রয়টার্স লিমিটেড। ১৯২৩ সালে রয়টার্স প্রথম রেডিও-র মাধ্যমেও আন্তর্জাতিক মতবাদ পরিবেশনের পৃথিবীতে পা রেখে।

ভেতরের সুপ্ত-গুপ্ত সংবাদ পেয়ে বা সংবাদের সূত্র পেয়ে সেটিকে সকলের আগে প্রকাশ করাকে বলে 'স্কুপ নিউজ'। রয়টার্স তার দীর্ঘদিনের সংবাদসংস্থায় ইতিহাসে বহু স্কুপ খবর প্রকাশ করেছে, সবার আগে। এর মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হল, আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের, ইউরোপ হত্যাকাণ্ডের খবর। আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল, ১৯৬১ সালে রয়টার্স প্রথম বার্লিন প্রাচীর তৈরির সংবাদ প্রকাশ করে। ১৯৮৯ সালে আবার রয়টার্সই প্রথম বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলার সংবাদ প্রকাশ করেছিল।

ইরাক থেকে তুরস্ক কিংবা সিরিয়া কিংবা চীন থেকে নায়ানমার—পৃথিবীর বহু প্রান্তে রয়টার্স সংবাদসংস্থায় সাংবাদিকরা কখনও বন্দি থেকেছেন। কখনও আটকে রেখেও ছাড়া হয়নি। কখনও হত্যা করা হয়েছে বলেও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৬০০টি জায়গায় রয়টার্সের প্রায় ৬০০ জন চিত্র সাংবাদিক এবং ২৫০০ জনের বেশি সাংবাদিক নিরন্তর সংবাদ সংগ্রহ করে চলেছেন।

২.১.৮ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP)

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বা এপি-র মূল সদয় শহর হল আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে। ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই সংবাদ সংস্থা বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম নামকরা সংস্থা। ১৯১৭ সালে পুলিৎজার পুরস্কার চালু হওয়ায় পর অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ৫৬টি পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে। এর মধ্যে ৩১টিই চিত্র সংবাদিকতায়। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস প্রথম ১৮৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সমস্ত খবর পরিবেশন করে। বর্তমানে পৃথিবীর ১০৬টি দেশে ২৬৩টি নিউজ ব্যুরো অফিস রয়েছে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এর। এপি.র রেডিও নেটওয়ার্কও রয়েছে। ইংরেজি, স্প্যানিশ এবং আরবী—৩টি বর্তমানে এই সংবাদসংস্থা সংবাদও ছবি পরিবেশন করে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস যখন তৈরি হচ্ছে, তখন মেক্সিকো—আমেরিকার যুদ্ধ চলছে। মূল উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন। ফলে সেই সময়ের ৪টি নামকরা সংবাদপত্র—নিউইয়র্ক ক্যুরিয়ায় অ্যান্ড এনফোয়ারার, জার্নাল অব কমার্স, নিউইয়র্ক ইউনিং প্রেস, দ্য নিউইয়র্ক হেরাল্ড এবং দ্য সান একত্রিত হয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদসংস্থাটি তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীকালে কেন্ট কুপায় (১৯২৫-৫৮) যখন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর দায়িত্বে ছিলেন, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, সেই সময় দক্ষিণ আমেরিকা—ইউরোপ—মধ্যপ্রাচ্যে এই সংবাদসংস্থার শাখা বিস্তৃত হয়। একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহর, যেমন শিকাগো ও সান ফ্রান্সিসশোতে, এই সংবাদসংস্থা তার ব্যুরো অফিস খোলে। একবিংশ শতকের প্রথম দিকে সিদ্ধান্ত হয়—ইয়াহু, এম এস এন, গুগল নিউজ-এও এপি-র সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাবে এবং এই ব্যাপারে ওই সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে ইউটিউবের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এর বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর কাছ থেকে ১৯৪১ সালে ওয়াইড ওয়ার্ল্ড নিউজ ফটো সার্ভিস সংস্থাটি কিনে নেওয়া।

২.১.৯ সারাংশ

সংবাদসংস্থার একজন সাংবাদিকের কাছে একটি মিনিটের অর্থ হল ‘ডেডলাইন’। সংবাদসংস্থার একজন সাংবাদিক যেন সবসময় পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিকটতম টেলিফোন বুথ বা নিজের কমপিউটার-ল্যাপটপ থেকে দ্রুততম পদ্ধতিতে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অফিসে সংবাদ পাঠানোটাই তাঁর একমাত্র কাজ। সবসময় তাঁদের মাথায় রাখতে হয়, কোনও একটি সংবাদমাধ্যম কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠাতে পারছে না বলেই সংবাদসংস্থায় খবর কিনে, পরদিন প্রকাশ করে, পাঠক শ্রোতার মনের খিদে মেটাচ্ছে। সেইজন্য গোটা দেশের সংবাদ মাধ্যম যখন যে সংবাদ চেয়েছে, সংবাদসংস্থা সেই চাহিদা পূরণ করেছে। এককথায় বলা যায়, পাইকারি দরে বিশ্ববাজারে নিরপেক্ষ সংবাদ বিক্রি করে সংবাদ সংস্থা। ফলে সংবাদ সংস্থাগুলির ভূমিকাও বাড়ছে। পরবর্তীকালে ইন্টারনেট পরিষেবা অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ায় সংবাদ সংস্থার ওপর নির্ভরশীলতা বেড়েছি। এ এফ পি, এপি, রয়টার্স-এর বিশ্বখ্যাত সংবাদসংস্থা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু করেছে পথ চলা।

২.১.১০ অনুশীলনী

ক) সংক্ষিপ্ত নোট :

রয়টার্স, এ এফ পি, এপি,

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১) সংবাদসংস্থা কাকে বলে?

২) পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদসংস্থার নাম ও দেশ বলুন :

৩) পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো সংবাদসংস্থা কী এবং সেটি থেকে পরবর্তীকালে কোন কোন সংবাদসংস্থা তৈরি হয়?

৪) রয়টার্সের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ পরিবেশনের কথা উল্লেখ করুন।

৫) অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস—সংবাদসংস্থা তৈরির নেপথ্যে কোন্ কোন্ সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা ছিল?

৬) পৃথিবীর কটি দেশে এবং কটি শহরে রয়টার্স এবং এ এফ পি-র অফিস রয়েছে?

৭) সংবাদসংস্থা তৈরির ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে লিখুন।

২.১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১। News Agencies from Pigeon to Internet — KM Srivastava.

২। The Power of New — Donald Read.

৩। International News Agencies — Oliver Boyel–Barrett.

৪। News Agency Journalism — Dr. Madhuri Madhok

৫। সংবাদ প্রতিবেদন—ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

মডিউল ২ : সংবাদ সংস্থা

একক : ২ ◻ ভারতে সংবাদসংস্থার বিকাশ (Development of News Agencies in India)

২.২.০ গঠন

২.২.১ উদ্দেশ্য

২.২.২ প্রস্তাবনা

২.২.৩ পিটিআই (P.T.I) :

২.২.৪ ইউএনআই (UNI)

২.২.৫ হিন্দুস্থান সমাচার

২.২.৬ আই এ এন এস (IANS — ইন্দো এশিয়ান নিউজ সার্ভিস)

২.২.৭ সমাচার ভারতী (SB)

২.২.৮ সারাংশ

২.২.৯ অনুশীলনী

২.২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২.২.১ উদ্দেশ্য

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এ এফ পি-র মত নামকরা সংবাদ সংস্থার জন্ম হলেও ভারতের সংবাদমাধ্যমে কিন্তু তার ঢেউ এসে লেগেছিল অনেক পরে। বলা চলে, টেলিগ্রাফ আবিষ্কার এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সে টেলিগ্রাফ আইনের ব্যবহার করে নতুন সংবাদসংস্থায় জন্ম তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতকে নিজস্ব সংবাদসংস্থা তৈরির কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল। এর ফল হল, ১৯০৫ সালে তৈরি হয় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া (API)। উদ্যোগী পুরুষ, সে সময়ের বিশিষ্ট সাংবাদিক কে সি রায়। তিনি কাজ করতেন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ-এ এবং টেলিগ্রাম মারসৎ অফিসে সংবাদ পাঠাতেন। উষা নাথ, কলকাতায় সেই সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং এপিআই নিউজ এজেন্সির নামে বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দিতেন। 'দ্য হিন্দু' এবং 'স্বদেশ মিত্র' এই দুই সংবাদপত্রের সহযোগিতায় মাদ্রাজে একটি অফিসও খুলেছিলেন উষা নাথ। স্বাধীনতা লাভের পর এই সংস্থাই প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া নামে পরিচিত হয় এবং কয়েক বছর পর রয়টার্স থেকে এপিআই-কে কিনেও নেয় পিটিআই। সুতরাং ভারতের সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানতে হলে ভারতীয় সংবাদসংস্থাগুলি সম্পর্কে জানতে হবে।

এই এককের মূল আলোচ্য বিষয় হল—

* প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া

* ইউনাইটেড নিউজ অব ইণ্ডিয়া
* হিন্দুস্থান সমাচার
* আই এ এন এস
* সমাচার ভারতী

২.২.২ প্রস্তাবনা

স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে পুরনো সংবাদসংস্থা পিটিআই এবং বহু ভাষায় সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রথম সংবাদসংস্থা ইউ এন আই। এছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। কীভাবে প্রতিটি সংবাদসংস্থা বেড়ে উঠল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এই এসকে।

২.২.৩ পিটিআই (P.T.I) :

১৯৪৭ সালের ২৭ আগস্ট পথ চলতে শুরু করা প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া আজ ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ এজেন্সি। বর্তমানে এদের মূল কার্পলয়টি রয়েছে নয়াদিল্লিতে এবং এটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি অলাভজনক সংস্থা হিসেবে নথিভুক্ত। বর্তমানে ভারতের প্রায় ৫০০-র বেশি সংবাদপত্র পিটিআই থেকে সরাসরি সংবাদ সংগ্রহ করে এবং প্রকাশিত হয়। বলা যায়, ভারতের সংবাদমাধ্যমের প্রায় ৯০ শতাংশ বাজার দখল করে রয়েছে পিটিআই। ভারতের মূল প্রধান রাজধানী শহরগুলিতে প্রায় সব জায়গাতেই এদের অফিস রয়েছে এবং প্রতিটি অফিস থেকেই প্রয়োজনে পৃথিবীর প্রতি প্রচণ্ডে যোগাযোগ করা সম্ভব। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর, পিটিআই, রয়টার্স থেকে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া-কে কার্যও কিনে নেয় এবং পিটি আই-এর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া মিশে যায়। ইংরেজি এবং হিন্দি দুটি ভাষাতেই বর্তমানে সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা বর্তমানে রয়েছে। ১৯৯৯ সালে পিটিআই-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে লোগো-সহ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতের প্রথম নিউজ এজেন্সি হল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া (API)। তৈরি করেছিলেন প্রথম এক বাঙালি, কেসি রায়। সেটা ১৯০৫ সাল। সেই সময় কিছু সমস্যা তৈরি হলেও ১৯১৯ সালে রয়টার্স, এপিআই-এর দায়িত্ব নেয়। কিন্তু ক্রেডিট লাইন হিসেবে এপিতাই-এর নামই নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৭ এর ২৭ অগাস্ট, মাদ্রাজ শহরে পিটিআই আত্মপ্রকাশ করে এবং নতুন করে পথ চলা শুরু করে। ১৯৫৩ সাল থেকে রয়টার্সের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পিটিআই একক ভাবে কাজ করতে থাকে। ১৯৭৬ সালে এই নিউজ এজেন্সির ইকোনমিক সার্ভিস অর্থাৎ অর্থনীতি-বাজার সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের গল্প চালু হয়। ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে পিটিআই ফিচার সার্ভিস, ১৯৮১ এর অক্টোবরে পিটিআই সায়েন্স সার্ভিস, ১৯৮৬ এর ফেব্রুয়ারিতে পিটিআইটিডি, ১৯০৭-র অক্টোবরে পিটিআই ফটোগ্রাফি, ১৯৯২ এর আগস্টে পিটিআই গ্রাফিক্স সার্ভিস-এর শাখাগুলি একের পর এক চালু হতে থাকে।

বর্তমানে ভারতের প্রায় প্রতিটি সংবাদমাধ্যম অর্থের বিনিময়ে পিটিআই থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। পিটিআই-এর ছবিও বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—দ্য হিন্দু, টাইমস অব ইন্ডিয়া, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য হিন্দুস্থান টাইমস, দ্য স্টেটস্‌ম্যান, দ্য ট্রিবিউন, দ্য অল ইন্ডিয়া রেডিও, দূরদর্শন প্রভৃতি। ভারতের নানা প্রান্ত ছাড়াও বেজিং, ব্যাঙ্কক, কলম্বো, দুবাই, ইসলামাবাদ, কুয়ালালামপুর, মস্কো, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক শহরেও পিটিআই এর কার্যালয় এবং সাংবাদিক রয়েছে।

২.২.৪ ইউএনআই (UNI)

ভারতবর্ষ এক বহু ভাষার দেশ। তাই প্রয়োজন বহু ভাষার নিউজ এজেন্সি। ভারতের ????? মাধ্যমের ইতিহাসে বহু ভাষার নিউজ এজেন্সি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া (ইউ.এন.আই)। সেটা ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর। প্রথমে ইংরাজিতেই সংবাদ সরবরাহ শুরু হলেও পরবর্তীকালে হিন্দি এবং উর্দুতেও সংবাদ পাঠাতে শুরু করে ইউ.এন.আই ১৯৬১ এর ২১ মার্চ বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করে এই সংবাদ সংস্থা। সেইসঙ্গে এর হিন্দি ভাষার সংবাদ সংস্থা, ইউনি বার্তা (Univerta)-ও কাজ করতে শুরু করে। এর ৩০ বছর পর ১৯৯২ এর ৫ জুন, উর্দু ভাষায়, পৃথিবীতে প্রথম সংবাদ সংস্থা হিসেবে, ইউ.এন.আই-এর নতুন শাখা চালু হয়। এর ফলে এই সংস্থা পৃথিবীতে প্রথম উর্দু ভাষায় সংবাদ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের বহু শহর এবং মূলত রাজধানী শহরগুলিতেই এর অফিস রয়েছে। বিশ্বের নানা প্রান্তের বেশ কিছু নাম করা সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP আমেরিকা), ডয়েসে-প্রেসে-অ্যাগেস্টুর (Dentsche-Press-Agentur — জার্মানি), অ্যাজেনজিয়া ন্যাজনেল স্ট্যাম্পা অ্যাসোসিয়াটা (Agenzia Nazionale tamp a Associata—ইতালি), অ্যাজের প্রেস (Ager Press রোমানিয়া)-র সঙ্গে ইউ.এন.আই-এর বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে এবং ভাষা সেভাবে পৃথিবীর সংবাদ পরিবেশন করে।

কিন্তু ইউ.এন.আই-এর মত দ্বিতীয় সংবাদ সংস্থা তৈরির প্রয়োজন কেন হল? প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, ১৯৫২-৫৪ সালের মধ্যে প্রথম প্রেস কমিশন যে রিপোর্ট জমা দেয়, তাতেই পিটি আই-এর সমান্তরাল দ্বিতীয় সংবাদ সংস্থা তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। মূল উদ্দেশ্য, একটি সংবাদ সংস্থা কোনও কারণে ভুল সংবাদ পরিবেশন করলে অপর সংবাদ সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সংবাদ দেখে যেন সেটি সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব হয়। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে এগিয়ে আসেন পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. বিধানচন্দ্র রায়। সেই সময়ের ৮টি নামকরা সংবাদপত্র—দ্য হিন্দু, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দ্য দেটটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান টাইমস, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ডেকান হেরাল্ড এবং ????।

বর্তমানে ইউ.এন.আই-এর অনেকগুলি শাখা রয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে নানা ধরণের সংবাদ পরিবেশনের সুযোগ বেড়েছে। তৈরি হয়েছে ইউ এন আই ফটো সার্ভিস, ইউ এন আই গ্রাফিক্স, ইউ এন আই এনার্জি নিউজ সার্ভিস, ইউ এন আই ব্যাক গ্রাউন্ডার সার্ভিস, ইউ এন আই ফিনান্স সার্ভিস, ইউ এন আই এগ্রিকালচার সার্ভিস, এন আই স্ক্যান সার্ভিস ইত্যাদি।

২.২.৫ হিন্দুস্থান সমাচার

স্বাধীনতায় এক বছর পর ১৯৪৮ সালে একটি নিউজ এজেন্সি বা সংবাদ সংস্থা তৈরি হয় এবং বর্তমানে এর প্রধান কার্যালয় নয়ডা-তে। শিবরাম শঙ্কর আপতে ছিলেন এই সংবাদ সংস্থায় প্রতিষ্ঠাতা। যদিও বহু ভাষায় সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রেরণের পরিকাঠামো রয়েছে, তবুও সংবাদ পত্রগুলি হিন্দি ভাষায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য অনেকেই এই সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। বর্তমানে ১০টি ভাষায় এদের সংবাদ প্রেরণের কাজ চালু রয়েছে—বাংলা, ওড়িয়া, ওসমীয়া, তেলেগু, মালয়লম, উর্দু, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, হিন্দি এবং মারাঠী। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থায় প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল—পিটিআই, ইউ.এন.আই, সমাচার ভারতী এবং হিন্দুস্থান সমাচার—এই ৪টি সংবাদ সংস্থা জুড়ে যাবে এবং সমাচার নামে নতুন একটিই সংবাদসংস্থা গোটা দেশে কাজ করবে। পরবর্তীকালে এই ৪টি সংবাদ সংস্থা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়।

২.২.৬ আই এ এন এস (IANS) — ইন্দো এশিয়ান নিউজ সার্ভিস

১৯৮৬ সালে তৈরি হওয়া এই সংবাদ সংস্থা মূলত ভারত এবং উত্তর আমেরিকায় মধ্যে সংযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে এটি স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি সংবাদ সংস্থা এবং ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার সংবাদ সরবরাহের অন্যতম মাধ্যম। বর্তমানে এর ৬টি শাখায় রয়েছে—আই এ এন এস ইংরাজি, আই এ এন এস হিন্দি, আই এ এম এস পাবলিশিং, আই এ এন এস বিজনেস কনসালটেন্সি, আই এ এন এস সলিউশনস্ এবং আই এ এন এস মোবাইল।

২.২.৭ সমাচার ভারতী (SB)

ভারতের অন্যতম আর একটি সংবাদ সংস্থা হল সমাচার ভারতী। ১৯৬৭ সালে এটি পথ চলা শুরু করে এবং সেই সময় বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার বিশেষভাবে আর্থিক সাহায্য করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বিহার, গুজরাট, রাজস্থান এবং কর্নাটক। এবং এদের ৫০ শতাংশ শেয়ারের দাবিদার এই ৪টি রাজ্য। জয় প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন এর প্রথম চেয়ারম্যান। এই সংবাদ সংস্থার একটি হিন্দি শাখায়—'দেশ অউর দুনিয়া' এবং একটি ফিচার শাখা 'ভারতী' রয়েছে। ক্রীড়া সাংবাদিকতার ওপর এই সংবাদ সংস্থা একটু বেশি জোর দিয়ে সারা পৃথিবীর নানা ধরণের খোলার সংবাদ, সংবাদপত্রগুলিতে, টেলি প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রেরণ করতে থাকে।

২.২.৮ সারাংশ

ভারতের সংবাদ মাধ্যমকে সরকার বা সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর যতটা নির্ভর করতে হয়, পৃথিবীর বহু দেশে তা হয় না। অন্যদিকে রয়েছে সংবাদ পরিবেশনের তাড়না। পিটি আই এবং ইউ এন আইনে তাই অনেকটাই সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। দু'টি সংবাদসংস্থাই ভীষণভাবে চেষ্টা করছে, নিজেদের গ্রাহক ধরে রাখতে। কয়েক বছর ধরেই পিটি আই এবং ইউ এন আই, বিশ্বের নামকরা সংবাদসংস্থা রয়টার্স, এ.এফ.পি এবং এপি-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, যাতে তাদের সমস্ত খবর আমাদের দেশের সংবাদ সংস্থা পেতে পারে। আর এটাও উল্লেখযোগ্য, দুটি সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার নেপথ্যেই ছিলেন দুই বাঙালি। একজন বাঙালি সাংবাদিক কে সি রায়। অপরজন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি সংবাদ সংস্থায় জন্ম হয়েছে ভারতে। কিন্তু একাধিক সংবাদ সংস্থায় প্রয়োজন কেন, সেটাও বলা রয়েছে প্রথম প্রেম কমিশনের সুপারিশে। দেশে শুধুমাত্র একটিই সংবাদ সংস্থা থাকলে একছত্র আধিপত্য তৈরি হবে এবং ভুল সংবাদ প্রেরিত হলেও তা পরীক্ষার অবকাশ থাকবে না। সম্পূর্ণ এককটি তাই ভারতীয় সংবাদ সংস্থাগুলি নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

২.২.৯ অনুশীলনী

ক) সংক্ষিপ্ত নোট

পিটিআই, ইউ এন আই, আই এ এন এস

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

১। ভারতের কয়েকটি সংবাদ সংস্থায় পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত নাম লিখুন।

২। ভারতের সবচেয়ে পুরনো সংবাদ সংস্থাটি কী?

৩। ভারতের বাইরে কোন কোন হরে পিটিআইএর ব্যুরো অফিস রয়েছে এবং পিটিআই-এর বর্তমানে সংবাদ পরিবেশন সংক্রান্ত কটি শাখা রয়েছে?

৪। হিন্দুস্থান সমাচার এবং সমাচার ভারতী সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লিখুন।

৫। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে বর্তমানে ২টি উল্লেখযোগ্য সংবাদ সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২.২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। Mass Communication in India—Keval J Kumar.

২। Profesional Journalism—M V Kaunath.

৩। News Agency Journalism—R. Hakemulder Jau.

৪। Understanding Journalism — Lynethe Sheridan.

৫। India Journalism in a New Era—Oxford University Press.

৬। আধুনিকগণ মাধ্যম—ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য।

৭। সংবাদ বিদ্যা—ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

মডিউল ৩ স্বাধীনতার পরে প্রধান প্রবণতা

একক : ১ □ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে বেতার, টেলিভশন, স্যাটেলাইটে টিভি ও ইন্টারনেট-এর সম্প্রসারণ

৩.১.০ গঠন

৩.১.১ উদ্দেশ্য

৩.১.২ প্রস্তাবনা

৩.১.৩ স্বাধীনতার পরে বেতার সম্প্রচার

৩.১.৪ ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচার

৩.১.৫ স্যাটেলাইট টেলিভিশন সম্প্রচার

৩.১.৬ ভারতে ইন্টারনেটের প্রসার

৩.১.৭ সারাংশ

৩.১.৮ অনুশীলনী

৩.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলি কিভাবে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে ও রূপান্তরিত হয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বেতার, টেলিভশন, কেবল টিভি ও ইন্টারনেট স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও পরিবেশনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কখনো সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে, আবার কখনো বাজার কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের প্রবল দাবিতে গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো হয়েছে, আর সেই মতো নীতি নির্ধারণও হয়েছে। এই এককে বাধীনতা পরবর্তী গণমাধ্যমের পরিবর্তন ও প্রবণতাকেই বিশ্লেষণ করা হবে।

৩.১.২ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতীয় গণমাধ্যম একাধিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। ঠিক স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলো দেশ গড়ার আদর্শে গণমাধ্যমকে কাজে লাগানোর উৎসাহ থাকলেও আস্তে আস্তে ভারতীয় গণমাধ্যম বাজারমুখী হয়েছে। প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনও গণমাধ্যমের দিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এবং পরবর্তীকালে ইন্টারনেট যেমন জনমানসে প্রভাব ফেলেছে, ঠিক তেমনই এই গণমাধ্যমগুলিও

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সরকারি বিভিন্ন নীতির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। গণমাধ্যম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা গড়ে তোলার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই গণমাধ্যমগুলো নানান চড়াই উতরাই ধরে কিভাবে এগিয়ে চলেছিলো, সেই সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৩.১.৩ স্বাধীনতার পরে বেতার সম্প্রচার

১৯৩০ এর দশকে ভারত ভূখণ্ডে সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে অল ইন্ডিয়া রেডিওপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই গণমাধ্যমটি সেই সময় প্রশাসন কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল, কিন্তু তা সত্বেও তৎকালীন বহু ভারতীয় এবং বিপ্লবীদের কাছে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে রেডিও সচ্ছল পরিবারগুলিতে সংবাদ শোনার অভ্যাস তৈরী করে দিয়েছিলো এবং বিখ্যাত ভাষণ, নির্বাচনের ফলাফল, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদির মতো বহু ঐতিহাসিক ঘটনাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো। সময়ের সাথে সাথে রেডিও মাধ্যমটিও ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে শর্ট-ওয়েভ সার্ভিস চালু হওয়ার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রেডিওকে 'আকাশবাণী' নামকরণ করেন এবং ওই শিরোনামে একটি কবিতাও লেখেন। আকাশবাণী ছিল সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রধান এবং একমাত্র সংবাদ মাধ্যম। রেডিও স্বাধীনতার লাভের পরেই নতুন সরকার এবং তার জনগণের মধ্যে প্রথম সেতু হয়ে ওঠে যা বেশিরভাগ কর্মসূচি রেডিও নিউজ বুলেটিনগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো। বেতারে প্রচারিত জওহরলাল নেহেরু এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তৃতা সদ্য বিভক্ত ভারতে আশাবাদ বজায় রাখতে সহায়তা করেছিল। ষাটের দশকে যুদ্ধের সময় এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও রেডিও ভারতের সার্বিক মনোবল বাড়াতে সাহায্য করেছিল।

ছবি সৌজন্যে- Wikipedia

১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে বেশ কয়েক বছরের জন্য, অল ইন্ডিয়া রেডিও হিন্দি চলচ্চিত্রের গান সম্প্রচার বন্ধ করে দেয় কারণ তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বি ভি কেশকার, যিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওর দায়িত্বে ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে চলচ্চিত্রের গানগুলি অশ্লীল এবং পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি প্রথমে চলচ্চিত্রের গানের ওপর ১০ শতাংশ কোটা চাপিয়ে দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ফিল্ম প্রোডিউসার গিল্ড অফ ইন্ডিয়াতে আলোচনায় সমাধান না হওয়ায়, অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বেশ কয়েক বছর ধরে পুরোপুরি হিন্দি চলচ্চিত্রের গান সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় হিন্দি চলচ্চিত্রের সংগীত শোনার জন্য লোকে রেডিও সিলোন শুনতে শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যেই অনেক শ্রোতাই জনপ্রিয় হিন্দি গানের টানে রেডিও সিলোনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরে। এই পটভূমিতেই রেডিওর জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'বিনাকা গীতমালা', বিখ্যাত সঞ্চালক আমিন সায়ানির সঞ্চালনায়

প্রচারিত হতো। অবশেষে, ১৯৫৭ সালে বিবিধ ভারতী স্টেশনের মাধ্যমে অল ইন্ডিয়া রেডিও তার হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পেতে চেয়েছিলো।

১৯৭৮ সালের পরে ট্রানজিস্টরাইজড রেডিওর উদ্ভবের ফলে সাধারণ মানুষদের মধ্যে রেডিওর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যদিও সেই সময়ও রেডিও কেবলমাত্র এআইআরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষিকাজ এবং স্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলিতে জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে রেডিওতে শিক্ষামূলক বিভাগ এবং সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করা হত। বেতারে বিবিধ ভারতী নামে বিনোদনমূলক সম্প্রচারও ছিল যেখানে জনপ্রিয় হিন্দি ছবির গান বাজানো হত, এটি বেতারকে পপুলার কালচারের অঙ্গ করে তুলেছিল, যা আজ অবধি প্রচলিত। ১৯৯০ এর দশকে ভারতীয় শ্রোতারা ক্রমশ বেতার থেকে মনোযোগ সরিয়ে টেলিভিশনের দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করেন এবং রেডিও সেট বিক্রিও কমে গেছিলো। তবে, ২০০০ সাল থেকে আবার রেডিওর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এর পর থেকে বেতারের শ্রোতা ও আয় গড়পড়তা একটানা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। সম্ভবত বেতারের জনপ্রিয়তা পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে দায়ী ছিল, মোবাইল ফোনের বিকাশ ও এফএম সম্প্রচারের সূচনা। বেতার খুব সহজেই পোর্টেবল প্লেয়ার ও মোবাইল ফোনের সাথে সংযুক্ত হয়ে যেতে পেরেছিলো, আগের গণমাধ্যমগুলির মধ্যে যে সুবিধা ছিল না। এমনকি রেডিও রিসিভারগুলি, বাড়তি ব্যয় না করেই, যানবাহনের ভিতরেও সহজেই যুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে,—এই সমস্ত সুবিধাগুলোই ক্রমশ বেতারকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তদুপরি, ২০০০ সালে বেসরকারী সম্প্রচারকদের কাছে ১০৮টি এফএম ফ্রিকোয়েন্সি বিক্রি করার পরে ভারতীয় বেতার সম্প্রচারে আমূল পরিবর্তন আসে। যদিও ১৯৯০ এর দশকের গোড়া থেকেই টাইমস এফএমের উপস্থিতি ছিল, তবে সরকারের নিষেধাজ্ঞাগুলির জন্য এক দশক ধরেও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে রেডিও স্থান তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ২০০১ সালে রেডিও সিটি বেঙ্গালুরু বেসরকারি এফএম সম্প্রচারের এক নতুন ঘরানা শুরু করল যার সাথে আমরা এখন যথেষ্ট পরিচিত। বেশিরভাগ শহরে, এফএম-কে কেন্দ্র করে অল্প সময়ের মধ্যেই বেতার বেশ লাভজনক হয়ে উঠল আঞ্চলিক বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য।

৩.১.৪ ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচার

১৯৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচার চালু হয় প্রাথমিকভাবে দিল্লি থেকে পরীক্ষামূলক শিক্ষাবিষয়ক পরিষেবা হিসাবে। ইউনেস্কোর কাছ থেকে কুড়ি হাজার ডলার এবং ১৮০টি টিভি সেট, ফিলিপস কর্তৃক প্রদত্ত সরঞ্জাম, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি কর্তৃক প্রদত্ত প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে পাওয়া দশ বছরের জন্য আর্থিক সহায়তায় ভারতে টিভি সম্প্রচার চালু হয়েছিল। প্রথম দিকে অল ইন্ডিয়া রেডিও দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ২৫কিলোমিটার ব্যাপ্তি সহ এটি প্রতি সপ্তাহে দু'বার এক ঘন্টার জন্য প্রোগ্রাম সম্প্রচার হত। ১৯৬৫ সালে দৈনিক সম্প্রচার শুরু হয়েছিল এবং ১৯৭০ সালের মধ্যে দেশে প্রায় ২২০০০ টিভি সেট ছিল। ১৯৭২ সালে দ্বিতীয় শহর মুম্বাইতে টিভি সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের মধ্যে কলকাতা, চেন্নাই, শ্রীনগর, অমৃতসর এবং লখনউতে টিভি স্টেশন চালু হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৭৫-৭৬ সালে স্যাটেলাইট ইন্সট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট (ছন্স্কৃক্ক) এক বছরের জন্য, সফলতার সাথে, ভারতের অন্যতম দুর্গম ও স্বল্পোন্নত অঞ্চলের ২৪০০টি গ্রামে টেলিভিশন সম্প্রচারকে পৌঁছে দিয়েছিলো।

১৯৮২ সালে দিল্লি এবং অন্যান্য অঞ্চলের ট্রান্সমিটারগুলির মধ্যে নিয়মিত উপগ্রহ সংযোগ স্থাপন করা হয় ও তার সাথেই জাতীয় প্রোগ্রামের সূচনা হয়। এর পাশাপাশি স্বল্প ক্ষমতার ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে টিভি পরিষেবাগুলির

দ্রুত সম্প্রসারণের যুগটিরও সূচনা হয়েছিল। ১৯৮২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস দূরদর্শনের রঙিন সম্প্রচার চালু করার জন্য অনুপ্রেরণা এবং যথাযথ পরিকাঠামো দুটোই জুগিয়ে ছিলো।

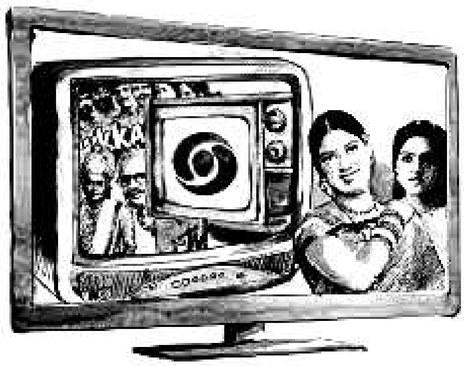

ছবি সৌজন্যে-indianexpress.com

এই সময়েই দিল্লি দূরদর্শন এবং অন্যান্য রাজ্যের দূরদর্শন কেন্দ্রগুলির মধ্যে নিয়মিত উপগ্রহ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। দুই বছর পরে, ডিডি -২ নামে একটি দ্বিতীয় চ্যানেল চালু হয়েছিল এবং পরিষেবাগুলি মুম্বাই, কলকাতা এবং চেন্নাইয়ে প্রসারিত করা হয়েছিল। যেহেতু চারটি মহানগর শহরগুলি সংযুক্ত ছিল সেই জন্যই চ্যানেলটিকে "মেট্রো চ্যানেল" নামকরণ করা হয়েছিল তবে, এটি সাধারণত বিনোদন চ্যানেল হিসাবেই বর্ণনা করা হয়। তৃতীয় চ্যানেল, ডিডি -৩ চালু করতে দূরদর্শনের তের বছর সময় লেগেছে। ১৯৯৫ সালে এটি একটি ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তবে, ততক্ষণে সরকারী গণমাধ্যম বেসরকারী কেবলটিভি এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলির তীব্র প্রতিযোগিতার চাপে পড়েছিল। কেবল টেলিভিশন এই সময়ে সারা ভারতবর্ষে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, বিশেষত দেশের শহুরে এবং আধা-শহুরে অঞ্চলে। এমনকি বেশকিছু বিদেশী চ্যানেলগুলিও ভারতীয় দর্শকদের মনে গভীরভাবে জায়গা করে নিয়েছিল।

दूरदर्शन

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

সময়ের সাথে সাথে ভারতে টেলিভিশন তার প্রসার এবং জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। দূরদর্শন হ"ল পাবলিক টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান যা প্রসার ভারতী কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলি ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে দিয়েছিল। বর্তমান সময়ে, প্রায় এক হাজার বিদেশী এবং দেশীয় টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে যা দূরদর্শনের সাথে প্রতিদিন প্রতিযোগিতা করে চলেছে। ভারতে টেলিভিশন

শিল্প বেশ কয়েকটি কারণ এবং পরিস্থিতির জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। জাতীয় টেলিভিশন সিস্টেমগুলির বাণিজ্যিকীকরণ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দূরদর্শনের বাণিজ্যিকীকরণ এবং স্পন্সররশিপ-এর দিকে ঝোঁক অর্থনৈতিক উদারিকরণের নতুন যুগের ক্রমবর্ধমান নব্য-উদারপন্থী নীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। উদারিকরণ কেবলমাত্র টেলিভিশনের ক্ষেত্রেই নয়, বরং এটি সংবাদ, মুদ্রণ, সম্পাদনা এবং পরিবেশন করার ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল।

বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য এবং পরিবর্তিত সময় ও প্রয়োজন অনুসারে সম্প্রচার পরিষেবা সংশোধন করার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। যার নিরিখে পরবর্তীকালে সম্প্রচার ব্যবস্থার সংস্কারও করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে ভারত সরকার সম্প্রচার-সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করার জন্য প্রসার ভারতী আইন প্রণয়ন করে। ভারত সরকার বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যমকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখার জন্য সম্প্রচারনীতিকে উদারিকরনের দিকে এগিয়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শনকে প্রসার ভারতী কর্পোরেশনের আওতায় আনা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায় (১৯৯৫) এর পরে ভারতে বৈদ্যুতিন মিডিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি পরিবর্তন ঘটেছিলো; সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে এয়ারওয়েভ-এর ওপর অধিকার সরকারের একচেটিয়া হতে পারে না বরং এয়ারওয়েভ-এর ওপর অধিকার সকল নাগরিকের। এই রায়ের পর এফএম সম্প্রচার থেকে শুরু করে, কমিউনিটি রেডিও ও কেবল টেলিভিশনের প্রসার ও জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

টেলিভিশন পরিষেবাগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ বিনোদন এবং বিজ্ঞাপন পরিষেবাকে অনেক বেশি পরিমানে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ১৯৮০-এর দশক থেকেই টেলিভিশন আধা-বাণিজ্যিক মাধ্যম হয়ে ওঠে এবং বিশ্বায়নের পরে ভারতীয় সম্প্রচারের দ্রুত বাণিজ্যিকীকরণ হয়। ক্রমশ টেলিভিশনকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের উৎসাহে ভাটা পড়তে থাকে ও বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলির প্রবেশের ফলে বাণিজ্যিকীকরণের চাপ থাকার ফলে জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যা কিছু করছিল তা আরও হ্রাস পেয়ে যায়। অর্থাৎ, বাজার-অর্থনীতির প্রভাব টেলিভিশনের বিষয়বস্তু এবং ভূমিকাটিকে উন্নয়ন থেকে বিনোদন-মুখী করে তুলেছে। সারা পৃথিবীজুড়ে বিশ্বায়ন ভোগবাদী সংস্কৃতিকে আরও প্রসারিত করেছে টেলিভিশনের সহায়তাতেই।

৩.১.৫ স্যাটেলাইট টেলিভিশন সম্প্রচার

ভারতে গণমাধ্যমের উদারিকরণ বিভিন্ন পরিসরে যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছে। ভারতে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলির উত্থান দেশে সম্প্রচার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিয়ে আসে। পৃথিবীর বিখ্যাত মিডিয়া সংস্থাগুলি, যেমন নিউজ কর্প, ডিজনি, রয়টার্স ভারতীয় সম্প্রচারের বাজারে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলির সাথে সংযুক্তও হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভারতে প্রতিযোগিতামূলক সম্প্রচারের যুগ এনেছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের প্রসার দূরদর্শনে আরও উন্নতমানের ও নানা ধরণের অনুষ্ঠানের অভাব, পেশাদারিত্ব এবং পরিবেশনায় বৈচিত্রের অভাবের জন্যও ঘটেছে। অপরদিকে বেসরকারি টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদের সংবেদনশীলকরণ এবং তুচ্ছকরণ জনসাধারণের সমালোচনাও আকৃষ্ট করেছে।

ছবি সৌজন্যে-vectorstock.com

নব্বই দশকের গোড়ার দিকেই একাধিক অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়েছিল উদারিকরণের নীতিকে কেন্দ্রে রেখে, এর মধ্যেই সম্প্রচার শিল্পকে উদারিকরণ ও কেবল টিভি সম্প্রচারকে উৎসাহ দেওয়ার মতো একাধিক অর্থনৈতিক সংস্কারও ছিল। এটি ভারতীয় কেবল টিভি শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় এবং রুপার্ট মারডকের স্টারটিভি নেটওয়ার্ক, এমটিভি এবং সিএনএন-এর মতো অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করে। ভারতে কেবল টিভি সম্প্রচারের একেবারে প্রথম যুগে, হংকং-ভিত্তিক স্টার টিভি নেটওয়ার্ক বেশ কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল ভারতে সম্প্রচার শুরু করেছিলো। যে সম্প্রচার পরিসর তখনও অবধি ভারত সরকার পোষিত দূরদর্শন দ্বারা একচেটিয়াবদ্ধ ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই কেবলের মাধ্যমে সম্প্রচারকারী প্রথম ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভারতীয় চ্যানেল জি টিভি চালু হয় ও এশিয়া টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (এটিএন) এর সম্প্রচার শুরু হয়। বেশ কিছু বছরের মধ্যেই ডিসকভারি চ্যানেল, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল ও স্টার টিভি নেটওয়ার্ক স্টার ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া, স্টার স্পোর্টস, ইএসপিএন, চ্যানেল-ভি এবং স্টার গোল্ড প্রচারের সাথে সাথে দর্শকদের বিনোদন ও সংবাদের বৈচিত্রকে আরও প্রসারিত করে। নব্বইয়ের দশকে, হিন্দি ভাষার চ্যানেলের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক এবং ইংরেজি ভাষার চ্যানেলও সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ২০০১-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক চ্যানেল এইচবিও এবং হিস্ট্রি চ্যানেল পরিষেবা সরবরাহ শুরু করে। আরও দুই বছরের মধ্যে অন্যান্য আন্তর্জাতিক চ্যানেল যেমন নিকেলোডিয়ন, কার্টুন নেটওয়ার্ক, ভিএইচ ১, ডিজনি এবং টুন ডিজনি ভারতের সম্প্রচার পরিসরে প্রবেশ করেছিল। ২০০৩ সাল থেকে বিভিন্ন ভাষায় চব্বিশ ঘন্টার সংবাদ চ্যানেলের সম্প্রসার ঘটেছে; তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হ'ল এনডিটিভি, সিএনএন আইবিএন এবং আজতক। একই সাথে জেনেরাল এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল (ওক্কখ)- এর তালিকা যেমন, ইউটিভি মুভিজ, ইউটিভি বিন্দাস, জুম, কালার্স, নাইন-এক্স, প্রায় দৈনিকভাবেই বেড়ে চলেছে।

কেবলটিভি ব্যবসায়ে লাভ দেখে, প্রচুর সংখ্যক মানুষ খুব অল্প সময়ের মধ্যে কেবলটিভি নেটওয়ার্ক স্থাপন করে ফেলেছিল। ১৯৯৫-৯৬ সাল নাগাদ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে দেশে আনুমানিক ষাট হাজার কেবল অপারেটর বিদ্যমান ছিল। তাদের অনেকেরই গ্রাহক সংখ্যা ছিল পঞ্চাশজন থেকে এক হাজারের মধ্যে। এই সময় বেশিরভাগ নেটওয়ার্কগুলি কেবল ৬ থেকে ১৪টি চ্যানেল রিলে করতে পারতো, কেননা আরও বেশি সংখক চ্যানেল রিলে করার জন্য উচ্চ মানের প্রযুক্তির প্রয়োজন ছিল যা আরও বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং সেই সময় কেবল অপারেটররা এতটা বিনিয়োগ করতে সক্ষম ছিল না। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই, একাধিক কেবল অপারেটর একসাথে হয়ে মাল্টি সিস্টেম অপারেটর (MSO)-এর সূচনা করে। এই এমএসও পরবর্তী কালে স্যাটেলাইট ও কেবল টিভির ক্ষেত্রে অন্যতম অঙ্গ হিসাবে নিজেদের জায়গা করে নেয়। বর্তমানে সিটি কেবল,

মন্থন, হ্যাথওয়ে-এর মতো ১১০০-এরও বেশি এমএসও আছে যারা এক লক্ষ্যেরও বেশি কেবল অপেরাটরকে পরিষেবা দিয়ে থাকে।

২০০১ সালে থেকেই কন্ডিশনাল অ্যাক্সেস সিস্টেম (ক্যাস)-এর মাধ্যমে টেলিভিশন সম্প্রচারের নীতি আলোচিত হতে থাকে। কন্ডিশনাল অ্যাক্সেস সিস্টেম হ'ল সেট-টপ বক্স (এসটিবি) এর মাধ্যমে ডিজিটাল উপায়ে টিভি চ্যানেলগুলির সম্প্রচার। সম্প্রচারের সিগন্যাল এনক্রিপ্ট করা থাকে এবং দর্শকদের সিগন্যালটি গ্রহণ ও ডিক্রিপ্ট করার জন্য একটি সেট-টপ বক্স কিনতে বা ভাড়া করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে চ্যানেলগুলি এবং তারপরে কেবল অপারেটরদের দ্বারা মূল্য বাড়ানোর বিষয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ক্যাসের পরিকল্পনাটি ধীরে ধীরে খারিজ হয়ে যায়। সেই জায়গায় আসে ডিজিটাল এড্রেসেবেল সিস্টেম। তবে সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, ক্যাসের মাধ্যমেই ভারতীয় কেবল সম্প্রচারের ডিজিটালকরণের ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্যাস পরিষেবা ও ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) পরিষেবার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেবল টিভি এবং ডিটিএইচ, টেলিভিশনের সিগন্যাল পৌঁছে দেওয়ার দুটি আলাদা পদ্ধতি। যেখানে, কেবল টিভি তারের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকের ঘরে পৌঁছে যায়, ডিটিএইচটি একটি ছোট ডিশ এন্টেনা এবং একটি সেট-টপ বক্সের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়। রিলায়েন্সের মালিকানাধীন বিগ টিভি, ডিডি-ডাইরেক্ট প্লাস, ডিশটিভি, সান ডিরেক্ট, টাটা স্কাই, এয়ারটেল টিভি, ভিডিওকন ডিটুএইচ- এর মতো একাধিক সংস্থা ডাইরেক্ট টু হোম সার্ভিস দিয়ে থাকে। বর্তমানে ভারতে পাঁচ কোটিরও বেশি বাড়িতে ডিটিএইচ পরিষেবা আছে।

আবার ডিজিটাল এড্রেসেবেল সিস্টেম (ঙঅঝ), যা ২০১২ সাল থেকে বাস্তবায়িত করা শুরু হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল। অর্থাৎ ক্যাস-এর ক্ষেত্রে ফ্রি-টু এয়ার (এফটিএ) চ্যানেলগুলি এনালগ হিসাবে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বহন করা হলেও পে চ্যানেলগুলি এনক্রিপ্টড এবং ডিজিটালি মডিউলেটেড ফর্মে বহন করা হয় যার জন্য একটি এসটিবি প্রয়োজন হয়। কিন্তু ডিজিটাল এড্রেসেবেল সিস্টেম-এর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বহন করা সমস্ত চ্যানেলগুলি এনক্রিপ্ট করা হয় এবং ডিজিটালি মডিউলেট করা হয়, ফলে ফ্রি-টু এয়ার এবং পে-চ্যানেল, উভয় চ্যানেলগুলিই পাওয়ার জন্য একটি এসটিবি আবশ্যক। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ২০১২ সাল থেকে শুরু করে, বাধ্যতামূলকভাবে চারটি পর্যায়ে, ধাপে ধাপে সমগ্র ভারতের সমস্ত কেবলটিভিকেই ডিজিটাল এড্রেসেবেল সিস্টেম-এর আওতার মধ্যে আনতে হবে। এই 'সুইচওভার' সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরে কেবল টিভি পরিষেবা কেবলমাত্র ডিজিটাল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই গ্রাহকের কাছে পৌঁছবে।

২০১৬ সালের হিসাবে, ভারতে ১৬০০ টিরও বেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারিত হয়। এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দূরদর্শন ছাড়াও স্টার টিভি, সনি মালিকানাধীন সনি টেলিভিশন, জি টিভি, সান নেটওয়ার্ক, এশিয়ানেটের মতো কয়েক হাজার বেসরকারি চ্যানেল আছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ভারতের মতো বৃহৎ রাষ্ট্রে, বিশেষত যে সমস্ত জায়গায় টেরিস্ট্রিয়াল সিগন্যাল পৌঁছনো যথেষ্ট অসুবিধাজনক, সেই সব অঞ্চলে বিনোদন, তথ্য ও সংবাদের বৈচিত্রময় জগৎ খুলে দিয়েছে। জিও-স্টেশনারি কক্ষপথে একটি উপগ্রহ মারফত টেলিভিশন সম্প্রচার করা একটি উপযুক্ত উপায় বলে মনে করা হয়। টেলিভিশন সিগন্যালের ফুট-প্রিন্ট পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে। ১৯৯১ সালের আগে মাত্র দুটি চ্যানেল থেকে, ভারতীয় দর্শকরা পাঁচ বছরের মধ্যে ৫০টিরও বেশি চ্যানেলের সুবিধা পেয়ে যান। সফটওয়্যার প্রযোজকরা প্রায় রাতারাতি প্রোগ্রামিংয়ের ঘাটতি পূরণে নিজেদের জায়গা করে নেন ও প্রভূত মুনাফাও লাভ করেন। টেলিভিশন সম্প্রচারের এই পরিবর্তন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, বিজ্ঞাপন জগৎ এবং কিছুটা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিলো।

৩.১.৬ ভারতে ইন্টারনেটের প্রসার

ভারতে প্রথম সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল) দ্বারা ১৫ই আগস্ট ১৯৯৫ সালে চালু হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে ভারতে ইন্টারনেটের পরিষেবা কয়েকটি প্রধান শহরে মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আর সব নিয়ন্ত্রণই সরকারের হাতে ছিল। সেই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন ভিএসএনএল, ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ ছিল। ল্যান্ডলাইনের মাধ্যমে অনিয়মিত সংযোগ এবং খুব অল্প ব্যান্ডউইথ গ্রাহকের কাছে পৌঁছতো। ইন্টারনেটে সার্ফিং-এর সময় প্রায়সই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং এই পরিষেবার মূল্য তখনকার সময়ে বিশ্বের মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চ ছিল। ফলস্বরূপ, ১৯৯৮-এর শেষদিকে, ভারতে তখন কেবলমাত্র দেড় লক্ষ্য ইন্টারনেট সংযোগ ছিল। যদিও এই কম সংখ্যক গ্রাহক ও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা উদ্যোক্তাদের উৎসাহকে কমিয়ে দেয়নি যারা প্রথম থেকেই ইন্টারনেট পরিষেবার বাণিজ্যে নেমেছিলেন। এইসময়, রিডিফ ডটকম, সান্টাবান্টা ডটকম, নৌকরি ডটকম, খেল ডটকম, বাজী ডটকম থেকে শুরু করে হটমেল ইমেল পরিষেবা (যা পরে মাইক্রোসফট কিনে নেয়) অবধি চালু হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে ইন্টারনেট ব্যবসায়ের জন্য অর্থের প্রাপ্যতার অভাব ছিল না। বহু বিদেশী মূলধনি সংস্থাগুলি ভারতে তাদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছিলো। ২০০০ সালের মধ্যেই বিনিয়োগকারীদের ইতিবাচক ধারণার ফলস্বরূপ বিবাহ, গেমস, গসিপ, কাজকর্ম, রান্না করা, খবর ইত্যাদি সমস্ত ধরণের ওয়েবসাইটের সম্প্রসারণ ঘটে। ১৯৯৬ সালের মধ্যেই টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দা হিন্দু, টি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, হিন্দুস্তান টাইমস ইত্যাদি সংবাদপত্র তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরী করে ফেলে। ১৯৯৮ সালে সিফি প্রথম বেসরকারি ইন্টারনেট পরিষেবার অনুমতি পায়। পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো 'সাইবার ক্যাফে' গজিয়ে উঠতে থাকে ১৯৯৮ সাল থেকেই। এই সময়টিকে 'ডট-কম বাবল' বলা

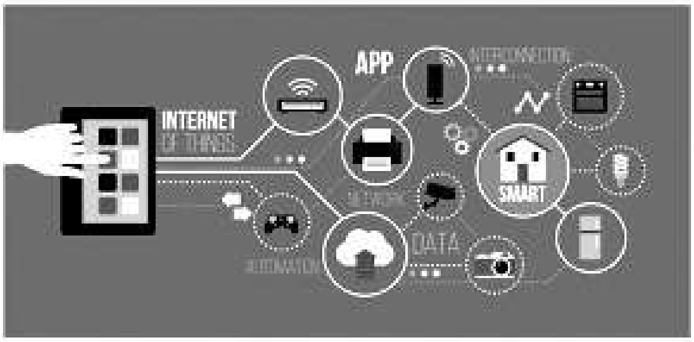

ছবি সৌজন্যে-shtterstock.com

হয় কেননা নব্বই দশকের শেষদিকে ইন্টারনেট-সম্পর্কিত সংস্থাগুলি নিয়ে অতিরিক্ত আশা করে স্টক মার্কেট ফুলে ফেঁপে ওঠে যার ফলে ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসায় ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। তবে ২০০১ সালের মধ্যেই এই ডট-কম বাবলটি বিদীর্ণ হয়। অবশেষে ২০০১ সালেই বিনিয়োগের তুলনায় খুবই অল্প পরিমান উপার্জন, অলাভজনক ব্যবসা পদ্ধতি ও অযৌক্তিক শেয়ার মূল্যায়নের ফলে 'ডট-কম ক্র্যাশ' ঘটে সারা বিশ্বজুড়েই। ইন্টারনেট ব্যবসার পতন বাজারে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগকারীরা মুখ ফিরিয়ে নেয় আর আস্তে আস্তে ইন্টারনেট ব্যবসায় মূলধনের প্রবাহ শুকিয়ে যায়। এই সময়ে, বেশ কয়েকটি ওয়েব ব্যবসা রাতারাতি উঠে যায় বা আর্থিক কষ্টে নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

ইন্টারনেটের সাথে সাথে বিশ্বজুড়ে মোবাইল ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। টেলিফোন, সংগীত, চলচ্চিত্র, এবং টেলিভিশন সহ বেশিরভাগ যোগাযোগ মাধ্যমগুলি মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুনরায় নিজেদের ঢেলে সাজিয়ে নিচ্ছে। ভয়েস ওভার মোবাইল ইন্টারনেট প্রোটোকল (ভিওআইপি) এবং মোবাইল ইন্টারনেট প্রোটোকল টেলিভিশন (আইপিটিভি) এর মতো নতুন পরিষেবাগুলির জন্ম দিয়েছে। আবার মুদ্রণ প্রকাশনা, ওয়েবসাইট প্রযুক্তি কিংবা ব্লগিং-এর কাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। মোবাইল ইন্টারনেট তাৎক্ষণিক বার্তাপ্রেরণ, মোবাইল ইন্টারনেট ফোরাম এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের মধ্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রূপগুলিকে নতুনত্ব দিয়েছে। বড় বড় খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র এবং ছোট কারিগর এবং ব্যবসায়ী উভয়ের জন্যই অনলাইনে শপিং বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থাও নিয়ে এসেছে।

ইন্টারনেটের জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত এখন দ্রুততম প্রবৃদ্ধির দিকনির্দেশ করছে। ভারতের ইন্টারনেট জনসংখ্যা জেট সেট গতিতে উর্ধমুখী হয়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে, আমেরিকাকে পিছনে ফেলে ভারত, চীনের পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছে। তরুণ সমাজের কাছে ইন্টারনেটের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন হ'’ল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং বা সোশ্যাল মিডিয়া। বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে উদ্ভুত হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া যা তথ্য বিতরণের ক্ষমতা, মতামতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে সংযোগ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের সুবিধা দেওয়ার ক্ষমতায় বলীয়ান। ভারতে সক্রিয়ভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে এমন লোকের সংখ্যা প্রায় তিরিশ কোটি আর সস্তা ব্রডব্যান্ড সংযোগ এবং ইন্টারনেট সক্ষম হ্যান্ডসেটের সহজলভ্যতার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.১.৭ সারাংশ

এই এককে আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি কিভাবে বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলো স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে ও রূপান্তরিত হয়েছে। বেতার স্বাধীনতা পরবর্তী কালে সংবাদ শোনার অভ্যাস তৈরী করে দিয়েছিলো এবং বহু ঐতিহাসিক ঘটনাকে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো। সময়ের সাথে সাথে, বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান ও স্টেশনের প্রসার ঘটে ও বেতার মাধ্যমটিও ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে ১৯৯০ এর দশক থেকে ভারতীয় শ্রোতারা ক্রমশ বেতার থেকে মনোযোগ সরিয়ে টেলিভিশনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যদিও, ২০০০ সাল থেকে মূলত মোবাইল ফোনের বিকাশ ও এফএম সম্প্রচারের সূচনার জন্য আবার রেডিওর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, শুরু থেকেই টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়েছে। বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলি ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রটি বেশ প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছে। অর্থাৎ, বাজার-অর্থনীতির প্রভাব টেলিভিশনকে ক্রমশ বিনোদন-মুখী করে তুলেছে। ১৯৯১ সালের আগে মাত্র দুটি চ্যানেল দেখার সুযোগ দর্শকরা পেলেও বর্তমানে ভারতীয় দর্শকরা ১৬০০টিরও বেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল দেখতে পারেন। টেলিভিশন সম্প্রচারের এই পরিবর্তন অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে, বাধ্যতামূলকভাবে চারটি পর্যায়ে, ধাপে ধাপে সমগ্র ভারতের কেবলটিভিকেই ডিজিটাল এড্ডেসেবেল সিস্টেম-এর আওতার মধ্যে আনতে হচ্ছে যার ফলে কেবল টিভি পরিষেবা কেবলমাত্র ডিজিটাল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই গ্রাহকের কাছে পৌঁছবে। একই রকম ভাবে, ভারতে প্রথম ইন্টারনেট পরিষেবা সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, ধীরে ধীরে এই পরিষেবার বেসরকারিকরণ হয়েছে। ১৯৯৮ সালের 'ডট-কম বাবল' ও ২০০১-এর ডট-কম ক্র্যাশকে পেরিয়ে এসে বর্তমানে ইন্টারনেট এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে

সাধারণ মানুষের জীবনে। মোবাইল ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তার ফলে অন্যান্য মাধ্যমগুলিও নিজেদের এই নব্যমাধ্যমের সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। বর্তমানে, ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ হিসাবে, ইন্টারনেটকে সামাজিক, বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে।

৩.১.৮ অনুশীলনী

১) স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে বেতারের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

২) এফএম ভারতে বেতারকে নতুন জীবন দান করেছে -- তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৩) ভারতে ১৯৭০-৮০র দশকে টেলিভশন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দুটি পদক্ষেপের সম্পর্কে লেখো।

৪) ভারতীয় কেবল টিভির ডিজিটাইজেশন সম্পর্কে লেখো।

৫) CAS এবং DTH-এর মধ্যে পার্থক্যগুলি কি কি ?

৬) ডটকম বাবল বলতে কি বোঝো?

৭) তুমি কি মনে করো মোবাইল ফোন ইন্টারনেট ব্যবহারকে বাড়িয়ে দিয়েছে?- ব্যাখ্যা করো।

৮) টীকা লেখো: (ক) ডিজিটাল এড্ডেসেবেল সিস্টেম (খ) সোশ্যাল মিডিয়া (গ) স্যাটেলাইট চ্যানেল।

৩.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) মাস কমুনিকেশন ইন ইন্ডিয়া, কেবল জে কুমার, জাইকো পাবলিশিং হাউস, ২০১৩।

২) হ্যান্ডবুক অফ জার্নালিজম এন্ড মাস কমুনিকেশন, বীর বলা আগরওয়াল, নেহা পাবলিশার্স, ২০১২।

৩) মাস কমুনিকেশন ইন ইন্ডিয়া, জে. ভি. ভিলানিলম, সেজ পাব্লিকেশন্স, ২০০৫।

৪) ইন্ডিয়ান মিডিয়া: গ্লোবাল এপ্রোচেস, এড্রিয়ান এথিক, পলিটি প্রেস, ২০১২।

মডিউল-৩ : স্বাধীনতার পরে প্রধান প্রবণতা

একক : ২ ◻ প্রেস কমিশন এবং প্রেস কাউন্সিল

৩.২.০ গঠন

৩.২.১ উদ্দেশ্য

৩.২.২ প্রস্তাবনা

৩.২.৩ প্রথম প্রেস কমিশনের উদ্দেশ্য

৩.২.৪ প্রথম প্রেস কমিশনের সুপারিশ

৩.২.৫ প্রথম প্রেস কমিশনের কৃতিত্ব

৩.২.৬ দ্বিতীয় প্রেস কমিশন

৩.২.৭ দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের উদ্দেশ্য

৩.২.৮ দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের সুপারিশ

৩.২.৯ প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (পিসিআই)

৩.২.৯.১ পিসিআই এর উদ্দেশ্যসমূহ

৩.২.৯.২ প্রেস কাউন্সিল-এর কাঠামো

৩.২.৯.৩ পিসিআই এর কার্য

৩.২.৯.৪ সেন্সর করার ক্ষমতা

৩.২.৯.৫ কাউন্সিলের সাধারণ ক্ষমতা

৩.২.১০ সারাংশ

৩.২.১১ অনুশীলনী

৩.২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৩.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে প্রেস কমিশন ও প্রেস কাউন্সিল বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল, গণতান্ত্রিক দেশে সংবাদমাধ্যম একটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নৈতিকতাকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য অবশ্যই কোনো বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই এককে, প্রেস কমিশন ও প্রেস কাউন্সিলের কার্যকারিতা, কাঠামো, উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ভারতের গণমাধ্যমের মান উন্নয়নের ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হবে।

৩.২.২ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতার আগে বেশিরভাগ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ও পত্রিকা সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটি মিশন হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছিল। তবে স্বাধীনতার পরে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের সামনে সঠিক দিশা বা উদ্দেশ্যের বিষয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিলো। অনেক মালিক কিংবা সম্পাদক তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। এই সময় অনেকগুলি সংবাদপত্র ও পত্রিকাই তাদের নীতিগত দিক থেকে সরে এসে, সংবাদমাধ্যমকে ব্যক্তিগত আক্রমণ, মানহানি ও অশোভনতার পরিসর হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। কিছু সংবাদপত্র ক্রমশ হলুদ সাংবাদিকতাকেও সাগ্রহে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল বলে মনে করা হয়। সুতরাং, সংবাদমাধ্যমের অসদাচরণগুলিকে বন্ধ করার জন্য এবং সাংবাদিকতার পেশাদারি মান উচ্চতর করার জন্য প্রেসের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা ও পরিকল্পনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রেস কমিশন এবং প্রেস কাউন্সিল এই উদ্দেশ্যগুলিকেই চরিতার্থ করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে ১৯৫২ সালে প্রথম প্রেস কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। বিচারপতি জি এস রাজাধ্যক্ষ ছিলেন প্রথম প্রেস কমিশনের সভাপতি। এটি ১৯৫২ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক দ্বারা গঠিত হয়েছিল। দশ সদস্যের ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্য সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ডঃ সি.পি.রামাস্বামী আইয়ার, আচার্য নরেন্দ্র দেও, ডাঃ জাকির হুসেন, এবং ডঃ ভি.কে.ভি. রাও। প্রেস কমিশনের সুপারিশ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের জমা দেওয়া নোট বিবেচনা করার পরে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ১৯৫৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন, যা ভারতীয় প্রেসের ক্ষেত্রে নীতি নির্দেশক নথিতে পরিণত হয়েছিল।

৩.২.৩ প্রথম প্রেস কমিশনের উদ্দেশ্যঃ

প্রথম প্রেস কমিশনের মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ

১) বাকস্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা।

২) হলুদ সাংবাদিকতা, উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ, জনসাধারণের উপর বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণ, অশোভন ও অমার্জিত সংবাদ প্রকাশ রোধ করা, সংবাদ উপস্থাপনে পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করা এবং মন্তব্যের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা প্রকাশ করা।

৩) নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, মালিকানা এবং আর্থিক কাঠামো পাশাপাশি দেশের সংবাদপত্র শিল্পের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা।

৩.২.৪ প্রথম প্রেস কমিশনের সুপারিশ

প্রথম প্রেস কমিশনের সুপারিশগুলিই প্রথম একটি দায়িত্বপূর্ণ প্রেসের কেমন হওয়া উচিত তার ধারণা দেয়ঃ

ক) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করতে এবং সাংবাদিকতার উচ্চমান বজায় রাখতে একটি প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ) সংবাদপত্রের প্রকাশনার হিসাব রাখার জন্য এবং প্রতি বছর সংবাদপত্রের অবস্থান নির্ধারণের জন্য সংবাদপত্রের নিবন্ধক (আরএনআই) নিযুক্ত হওয়া উচিত।

গ) ভয়াবহ প্রতিযোগিতা থেকে ছোট সংবাদপত্রগুলিকে রক্ষা করতে মূল্য-পৃষ্ঠার পরিকল্পনা চালু করা উচিত

ঘ) সরকার ও প্রেসের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য একটি প্রেস পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করতে হবে।

ঙ) কর্মজীবী সাংবাদিক আইন কার্যকর করতে হবে।

চ) এটি সংবাদপত্র এবং সংবাদ সংস্থাগুলির আর্থিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার জন্য একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছিল।

ছ) সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মূল নীতিগুলি রক্ষার জন্য এবং একচেটিয়া ব্যবসার প্রবণতার বিরুদ্ধে নতুন সংবাদপত্রগুলিকে সাহায্য করার জন্য একটি ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন গঠন করা উচিত।

জ) পিটিআইকে একটি সরকারী সংস্থাতে রূপান্তর করা প্রয়োজন।

ঝ) বিশেষতঃ উচ্চস্তরে, মূলধন এবং কর্মীদের উভয়েরই আঞ্চলিকীকরণ হওয়া উচিত; তাছাড়াও মূলত ভারতীয়দের হাতেই সংবাদপত্রের মালিকানার ভার থাকে প্রয়োজন।

৩.২.৫ প্রথম প্রেস কমিশনের কৃতিত্ব

প্রথম প্রেস কমিশনের বেশ কিছু প্রশংসনীয় সাফল্য রয়েছে। এই কমিশন সংবাদপত্র শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ১৯৬৬ সালে প্রেসের উপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশনা এবং সংবাদপত্রের নামের হিসাব সংরক্ষণের জন্য আরএনআই নিয়োগ করা হয়েছিল।

একই সালে, মূল্য-পৃষ্ঠার পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছিল; তবে, পরে এটি আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বাতিল করা হয়।

প্রেস পরামর্শদাতা কমিটি ১৯৬২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর গঠিত হয়েছিল।

১৯৫৫ সালে কর্মজীবী সাংবাদিক আইনটি গৃহীত হয়।

১৯৭২ সালের ১৪ই এপ্রিল সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার আর্থিক অবস্থান সম্পর্কিত একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এটি ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭৫ সালে তার প্রতিবেদন জমা দেয়।

সংবাদপত্রের ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয়তা নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছিল; ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিষয়ক একটি বিলও লোকসভায়ও উপস্থাপিত হয়েছিল, তবে তা আইন হিসাবে বলবৎ হাওয়ার আগেই, সেই বিল পাশ করার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

৩.২.৬ দ্বিতীয় প্রেস কমিশন

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা চলাকালীন, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় প্রেসের উপর প্রথম সরকারি নিষেধাজ্ঞার অভিজ্ঞতার ঠিক ১৫ মাস বাদেই দ্বিতীয় প্রেস কমিশন গঠিত হয়। জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়ার পরই ভারত সরকার ১৯৭৮ সালের ২৯শে মে দ্বিতীয় প্রেস কমিশন গঠন করে। দ্বিতীয় প্রেস কমিশন চেয়েছিল যে সংবাদমাধ্যম যেন কেবলমাত্র নির্বোধের মতো বিরোধী অথবা প্রতিবাদহীন মিত্র না হয়ে ওঠে। কমিশন চেয়েছিল, উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে সাংবাদিকতার একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। জনগণের কাছে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যাগুলি প্রতিফলিত করার জন্য প্রেস যেন সাধারণ মানুষের সহজ নাগালের মধ্যেই থাকে।

দুটি প্রেস কমিশনেই সংবাদমাধ্যমের বেশ কয়েকজন সম্মানিত সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রেস কমিশন সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছিল যে উন্নয়নই যে কোনও দেশের গণমাধ্যমের কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত, যা একটি স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। কমিশন ঘোষণা করেছিল যে দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের ধারণার সাথে স্বাধীন গণমাধ্যমের ধারণার কোনো বিরোধিতা নেই। স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব একে অপরের পরিপূরক, বিপরীতমুখী শর্ত নয়। সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে শহরের প্রতি পক্ষপাতিত্বর প্রশ্নটিও কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কমিশন উল্লেখ করেছিল যে উন্নয়ন হওয়ার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার মতো অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব রোধ করার জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং দায়িত্বও তুলে ধরেছিল।

৩.২.৭ দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের উদ্দেশ্য

- দ্বিতীয় প্রেস কমিশন যে সমস্ত উদ্দেশ্যগুলিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিল, সেগুলি হলো ঃ
- উন্নয়নশীল এবং গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা।
- বর্তমান সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত; এবং এই স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য আইন, বিধি ও নিয়মগুলির যথাযোগ্যতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার পক্ষে এটি পর্যাপ্ত কিনা।
- মালিকপক্ষের তরফ থেকে আসা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপের বিরুদ্ধে প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়।
- রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক নীতির প্রতি সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এবং দায়িত্ব গ্রহণ।
- মালিকানার কাঠামো, পরিচালনার রীতি এবং সংবাদমাধ্যমের আর্থিক কাঠামোর সাথে বৃদ্ধি, সম্পাদকীয় স্বাধীনতা এবং পেশাদারিত্বের সম্পর্ক।
- একজাতীয় বহুসংখক খবরের কাগজ এবং তাদের সাথে বাজার অর্থনীতির যোগাযোগ কিভাবে প্রতিযোগিতা ও পাঠকের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পাওয়া ও মন্তব্য করার অধিকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- সংবাদপত্র শিল্পের সাথে জড়িত অর্থনীতির আলোচনা।

৩.২.৮ দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের সুপারিশ

দ্বিতীয় প্রেস কমিশন সরকারের দায়বদ্ধ ও গঠনমূলক সমালোচক হিসাবে সংবাদ মাধ্যমকে দেখতে চেয়েছিলো। কমিশন অনুভব করেছিল যে কেবল বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু অবধি সম্পাদকদের কর্তৃত্ব সীমিত থাকা উচিত নয়, বরং বিজ্ঞাপনের জন্য কতটা স্থান সংবাদপত্রে রাখা হবে সে বিষয়েও সম্পাদকদের মতামতের অধিকার থাকা উচিত। প্রেস কমিশনের ধারণায়, জনগণের কাছে সংবাদ মাধ্যমের একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং দায়িত্ব রয়েছে এবং ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এটি অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে না। এই সকল ধারণার নিরিখে, দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের মূল সুপারিশগুলি ছিল ঃ

- সরকার ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত।
- ছোট ও মাঝারি সংবাদপত্রের উন্নতির জন্য সংবাদপত্র বিকাশ কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সংবাদপত্র শিল্পকে অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্যিক বিষয় থেকে পৃথক ভাবে ভাবা উচিত।
- পত্রিকার সম্পাদক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টি নিয়োগ করতে হবে।
- মূল্য-পৃষ্ঠার পরিকল্পনা চালু করা উচিত।
- ছোট, মাঝারি ও বড় সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদ এবং বিজ্ঞাপনগুলির একটি নির্দিষ্ট অনুপাত থাকতে হবে।
- সংবাদপত্রের শিল্পকে বিদেশী মূলধনের প্রভাব থেকে মুক্ত করা উচিত।
- কোন ভবিষ্যদ্বাণী সংবাদপত্র এবং পত্রিকাতে প্রকাশ করা উচিত নয়।
- বিজ্ঞাপন-চিত্রের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- সরকারের উচিত একটি দৃঢ় বিজ্ঞাপন নীতি প্রস্তুত করা।
- প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো পুনর্গঠন করতে হবে।
- সাংবাদিকতা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

৩.২.৯ প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (পিসিআই)

প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (পিসিআই) একটি স্বায়ত্তশাসিত, স্ব-নিয়ন্ত্রক, আইনী সংস্থা, যা গণমাধ্যমের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের ৪ জুলাই প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয় এবং ১৬ই নভেম্বর থেকে এই সংস্থা কাজ শুরু করে (সেই কারণে এই তারিখেই জাতীয় প্রেস দিবস উদযাপিত হয়) পিসিআইয়ের প্রথম সভাপতি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি জাস্টিস জে.আর. মুধোলকর।

পিসিআইয়ের মূল কাজটি প্রেসের স্বাধীনতা যাতে বজায় থাকে তা নিশ্চিত করা। তবে অভিযোগ প্রাপ্তির পরে শুনানি এবং যথাযথভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে, পিসিআই অভিযুক্ত সাংবাদিকদের সতর্ক করতে পারে বা সেন্সরও করতে পারে।

৩.২.৯.১ পিসিআই এর উদ্দেশ্যসমূহ

প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৬৫ অনুসারে প্রেস কাউন্সিল-এর মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা বজায় রাখা।

যথার্থ পেশাদারিত্বের মান অনুসারে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি তৈরি করা।

সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের পক্ষে উচ্চমানের জন-রুচির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নাগরিকত্বের অধিকার এবং দায়িত্ব উভয়ের যথাযথ বোধ জাগ্রত করা।

সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবায় নিজেকে নিয়োগ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া।

- জনস্বার্থের সাথে জড়িত সংবাদের সরবরাহ ও প্রচারকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এমন যে কোনও বিষয়কে নজরে রাখা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, ভারতের যে কোনও সংবাদপত্র বা নিউজ এজেন্সি যদি বিদেশী উৎস থেকে কোনো সাহায্য পেয়ে থাকে, তাহলে এই সম্পর্কিত বিষয়টিও নজরে রাখা।
- সঠিক সময়ে সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদ সরবরাহ ও প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা।
- সাংবাদিকতার পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
- সংবাদপত্রের প্রকাশনাতে নিয়োজিত সকল শ্রেণির ব্যক্তির মধ্যে যথাযথ ও কার্যকরী সম্পর্ককে উৎসাহিত করা
- যে সমস্ত প্রবণতাগুলির জন্য সংবাদপত্রের মালিকানা একচেটিয়া বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করা; এর মধ্যে থাকতে পারে সংবাদপত্রের মালিকানা ও তার আর্থিক কাঠামো বিষয়ে অনুসন্ধান; প্রয়োজনে প্রেস কাউন্সিল প্রতিকারের পরামর্শও দিতে পারে।

৩.২.৯.২ প্রেস কাউন্সিল-এর কাঠামো

শুরুতে পিসিআইয়ের ২৫ জন সদস্যের একটি কমিটি ছিল। বর্তমানে, এটি চেয়ারম্যানসহ ২৮ জন সদস্যের একটি কমিটি। নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারে এই ২৮ জন সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রেস কাউন্সিল অফ

ইন্ডিয়ার সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান, যিনি ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। বিচারপতি চন্দ্রমৌলী কুমার প্রসাদ বর্তমানে এই কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে নিয়োজিত আছেন। তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য নিয়োগ পেয়েছেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত, তাঁর পূর্বসূরি ছিলেন বিচারপতি মার্কান্দ কাটজু। বর্তমানে, কাউন্সিলের ২৮ জন সদস্য রয়েছে যার মধ্যে ২০ জনকে প্রেস সংস্থা, এজেন্সি এবং অন্যান্য সংস্থা মনোনীত করে প্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। সংসদের ২ টি হাউস দ্বারা ৫ জন সদস্য মনোনীত হন এবং ৩ জন সাংস্কৃতিক ও আইনী ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ভারতের বার কাউন্সিলের একজন মনোনীত হন। তারা তিন বছর মেয়াদের নির্দিষ্ট অধিবেশনের জন্য মনোনীত হন।

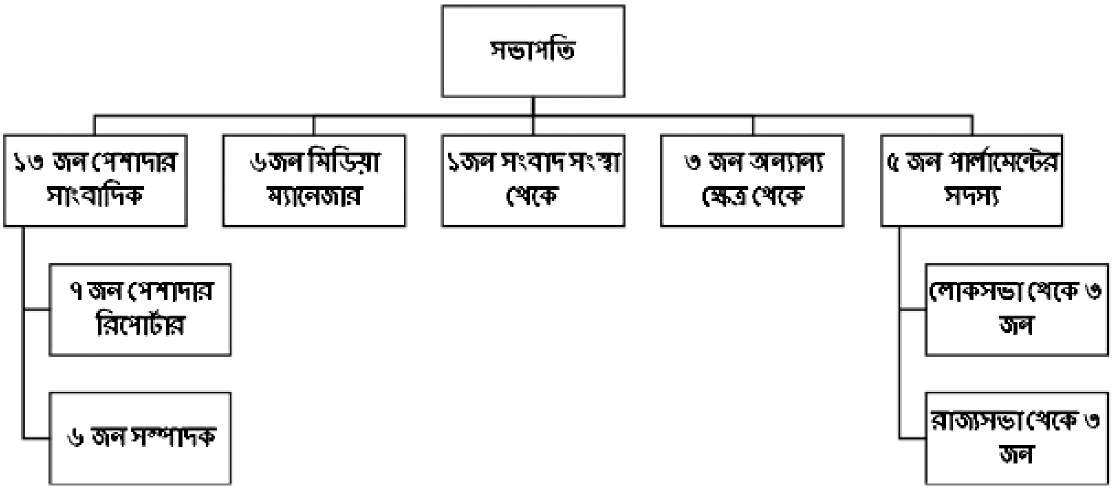

৩.২.৯.৩ পিসিআই এর কার্য ঃ

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পিসিআইয়ের মূল কাজটি হ''ল গণমাধ্যমকে পর্যবেক্ষণ করা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যাতে খর্ব না হয় সেই দিকে নজর রাখা। এই সমস্ত বিষয়গুলি প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৬৫-এর ১৪ এবং ১৫ নম্বর ধারায় দেওয়া রয়েছে। সেন্সর করার ক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে ১৪ নং ধারায় ও ১৫ নং ধারায় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিছু সাধারণ ক্ষমতার।

৩.২.৯.৪ সেন্সর করার ক্ষমতাঃ

সাংবাদিকতার নীতি, শোভনতা বা পেশাদারি আচরণের বিরুদ্ধাচারণ করার দোষ প্রমাণিত হলে সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা যে কোনও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে তদন্ত করার, সতর্ক করার অথবা সেন্সর করার অধিকার পিসিআইয়ের রয়েছে। এই বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পরে পিসিআই নিয়মানুবর্তিতামুলক ব্যবস্থা নিতে পারে। এই সমস্ত মামলার চূড়ান্ত রায় দেওয়ার আগে, কাউন্সিল সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে পারে। সভাপতির মতামত অনুসারে, তদন্ত করার জন্য যথার্থ ক্ষেত্র না থাকলে কাউন্সিল কোনও অভিযোগের উপর নজর নাও দিতে পারে। কাউন্সিল সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে নাম সহ যে কোনও তদন্ত সম্পর্কিত যে কোনও বিবরণ প্রকাশ করতে বলতে পারে। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তার বিরুদ্ধে কোনো আইন আদালতে কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না। এবং তাই পিসিআই প্রেসের স্বাধীনতা বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা উপভোগ করে তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এর কোনও দন্ডবিধায়ক ক্ষমতা নেই।

৩.২.৯.৫ অধীনে কাউন্সিলের সাধারণ ক্ষমতা ঃ

(১) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির অনুসারে, পিসিআই ভারতের দেওয়ানি আদালতে ন্যস্ত ক্ষমতাগুলি বেশ কয়েকটি উপভোগ করে। পিসিআই নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিতে পারেঃ

- ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের তলব করা ও তাদের উপস্থিত হতে বাধ্য করা; শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের উত্তর দিতে বলা।
- বিভিন্ন কাগজপত্র দেখতে চেয়ে পাঠানো ও প্রদর্শন করার নির্দেশ
- হলফনামা নিয়ে প্রমাণ দাখিল করানো
- কোনও আলত বা অফিস থেকে যে কোনও পাবলিক রেকর্ড-এর অনুলিপি অধিগ্রহণ।
- সাক্ষীদের বিষয়ে তদন্ত, নথিপত্র পরীক্ষা, বা অন্য কোনও নির্ধারিত বিষয়ের জন্য কমিশন গঠন করতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে সেই সংবাদপত্র দ্বারা প্রকাশিত বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিক কর্তৃক প্রতিবেদনে যে কোনও সংবাদ বা তথ্যের উৎস প্রকাশ করতে বাধ্য করতে পারবে না।

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক সংঘটিত প্রতিটি তদন্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৩ এবং ২২৮ ধারা অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় কার্যকলাপ বলে গণ্য করা হবে।

৩.২.১০ সারাংশ

সংবাদ মাধ্যম আজকের বিশ্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদগুলির মান অত্যন্ত উন্নত হওয়া উচিত কারণ ভারতের বৃহদ সংখ্যক নাগরিক সংবাদপত্র পড়ে এবং এটি তাদের দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। স্বভাবতই, সংবাদপত্রে কোনও অস্পষ্ট, অসত্য ও পক্ষপাতপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করা অনুচিত। প্রেস কমিশন ও প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর ভারতের সংবাদ মাধ্যমের পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নত হয়েছে। কোনও ভুয়া বা পক্ষপাতপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের আগে সাংবাদিকরা এখন ভয় পান কারণ এটি তাদের কর্মজীবনে প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাঁদের লাইসেন্সও বাতিল হতে পারে। একটি শক্তিশালী এবং সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য, সংবাদ মাধ্যমের সবরকম স্বাধীনতা উপভোগ করা উচিত, তবে তার সাথে থাকা উচিত যথার্থ দায়বদ্ধতা। গণমাধ্যমের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে যখন নিয়মভঙ্গ হয় অথবা অপেশাদারী আচরণের জন্য যখন সংবাদমাধ্যম সমালোচিত হয়, তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও সঠিক পথে চালিত করার জন্য অবশ্যই একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই নিয়ন্ত্রণটি সরকার বা কোনও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে না এসে, এই পেশার মধ্যে থেকেই উঠে আসা উচিত। এবং এই কাজগুলিই প্রেস কমিশন ও প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার দায়িত্ব।

৩.২.১১ অনুশীলনী

১) প্রথম প্রেস কমিশনের সুপারিশগুলি একটি দায়িত্বপূর্ণ প্রেসের কেমন হওয়া উচিত তার ধারণা দেয়- ব্যাখ্যা করো।

২) প্রথম প্রেস কমিশনের কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সম্পর্কে লেখ।

৩) দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের উদ্দেশ্যগুলি কী ?

৪) দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের সুপারিশগুলি সংক্ষেপে লেখো।

৫) রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রেস কাউন্সিল-এর কাঠামো ব্যাখ্যা করো।

৬) প্রেস কাউন্সিলের সাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে যা জানো লেখো।

৭) প্রেস কাউন্সিল আইনে বিবৃত উদ্দেশ্যগুলি কী ?

৮) টীকা লেখো: (ক) প্রেস কাউন্সিলের সেন্সর করার ক্ষমতা (খ) প্রেস কাউন্সিলের গঠন কাঠামো।

৩.২.১২ গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১) ভারতের প্রেস আইন, বংশী মান্না, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১।

২) ল অফ দ্যা প্রেস, দুর্গা দাস বসু, লেক্সিস নেক্সিস, ২০১০।

৩) মিডিয়া ল অ্যান্ড এথিকস, এম নীলামালার, প্রেন্টিস হল ইন্ডিয়া, ২০০৯।

৪) মিডিয়া ল, ডঃ এস আর মাইনেনি, এশিয়া ল হাউস, ২০১৭।

৫) ক্রাইসিস অফ ইন্ডিয়ান প্রেস, ইকোনমিক এন্ড পলিটিকাল উইকলি, সংখ্যা ১৭(২৩), ১৯৮২।

মডিউল-৩ স্বাধীনতার পরে প্রধান প্রবণতা

একক : ৩ ◻ ভারতীয় গণমাধ্যম ও বিশ্বায়ন

৩.৩.০ গঠন

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

৩.৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩.৩ বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম

৩.৩.৪ উদারীকরণ ও বিশ্বায়নঃ ভারতের প্রেক্ষিতে

৩.৩.৫ প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশ্বায়নের প্রভাব

৩.৩.৬ টেলিভিশনের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

৩.৩.৭ চলচ্চিত্র শিল্পের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

৩.৩.৮ এফডিআই ও ভারতীয় গণমাধ্যম

৩.৩.৯ সারাংশ

৩.৩.১০ অনুশীলনী

৩.৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৩.১ উদ্দেশ্য ঃ

এই এককে ভারতীয় গণমাধ্যমের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ও গণমাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। বিশ্বায়নের ফলে ভারতের গণমাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রিন্ট মিডিয়া ও টেলিভিশন থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র পর্যন্ত গণমাধ্যমের সমস্ত ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন এসেছে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ফলে। বিশেষ করে গণমাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়ার ফলে ভারতীয় গণমাধ্যমের পরিকাঠামো, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও বাজেট বিষয়ে একাধিক পরিবর্তন এসেছে। এই এককে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের গণমাধ্যমের যে রূপান্তরগুলি ঘটেছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৩.৩.২ প্রস্তাবনা

বিশ্বায়ন হ"ল বিশ্ব বাণিজ্য ও যোগাযোগের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতি, সমাজ এবং অর্থনীতিকে একীভূত করার প্রক্রিয়া। এটি মূলত অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। বিশ্বায়নের প্রভাব অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে যাতে নানা ধরণের পরিবর্তন

আসতে পারে। বিশ্বায়ন কেবল দেশের আর্থিক অবস্থাকেই প্রভাবিত করে না, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রও বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশ্বায়ন, বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য বিভিন্ন বৈদেশিক পণ্য সরবারহের পথও সুগম করে দেয়।

গনমাধ্যমের উপর বিশ্বায়নের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব সাধারণ মানুষের উপরও পরে। বিশ্বায়নের সর্বাধিক দৃশ্যমান প্রভাব হ"ল যোগাযোগ ব্যাবস্থার আসামান্য সম্প্রসারণ। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট এবং টিভি তথ্য ও বার্তা ছড়িয়ে দিতে ব্যাপক সহায়তা করেছে এবং বিশ্বজুড়ে মানুষকে একত্রিত হতে সাহায্য করেছে। যদিও, সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নিজস্ব কিছু অসুবিধা রয়েছে, আবার সুবিধাগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

গনমাধ্যমের বিশ্বায়ন বিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে অনুভূত হওয়ার মতো একটি অভিজ্ঞতা নয়। কলিন স্পার্কস যেমন যুক্তি দিয়েছে, কোনও গণমাধ্যমই সম্পূর্ণরূপে 'বিশ্বব্যাপী' নয়। তদুপরি, তথাকথিত গ্লোবাল মিডিয়াগুলির দর্শকবৃন্দ সংখ্যায় অল্প, বেশ ধনী এবং যথেষ্টভাবে ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী জন-পরিসর যে আদৌ প্রভাবশীল এমনটা প্রমাণ করা যথেষ্ট দুষ্কর এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জন-পরিসরের ধারণা এখনও রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ, বিশ্বায়ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, উভয় গণমাধ্যমের সহায়তাতেই যে সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন নেই।

'বিশ্বায়নের' এই প্রক্রিয়াটি প্রায়শই একটি ইতিবাচক শক্তি হিসাবে চিত্রিত হয় যা বিভিন্ন সমাজকে একইসূত্রে বেঁধে চলেছে। বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি একসাথে এসে একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ' এ পরিণত হচ্ছে এবং এর ফলে সমাজ, অর্থনীতি ও বাণিজ্য সমৃদ্ধও হচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াটি যেন মানুষের বিবর্তন এবং অগ্রগতির একটি অনিবার্য ফল হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে; যেন এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রকৃতির আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে মনে রাখা প্রয়োজন,বিশ্বায়ন কিন্তু বিশ্বব্যাপী মানুষ ও সংস্কৃতির মধ্যের যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটি স্বাভাবিক অগ্রগতি নয়। বরং এটি হলো, শক্তিশালী দেশগুলি, বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি, এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির নিজস্ব কিছু নীতি নির্ধারণের ফল, যাতে অনেকসময়ই তাদের নিজেদের স্বার্থও জড়িত থাকে। বিশ্বায়নের ফলেই কিন্তু নতুন যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি বিদেশী বাজারে প্রবেশ করে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলির জন্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের পদ্ধতি সরবরাহ করেছে।

৩.৩.৩ বিশ্বায়ন ও গনমাধ্যম

'বিশ্বায়ন' নব্বইয়ের এর দশকে একটি অন্যতম পরিভাষা হিসাবে দেখা দিয়েছিলো। তবে, 'বিশ্বায়ন' এর অনেক অর্থ রয়েছে। সমসাময়িক মিডিয়া বিশ্বায়নের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। যার বৈশিষ্টগুলি হলো:

- বিশ্বব্যাপী (কেবল জাতীয় বা আঞ্চলিক নয়) পরিসরকে মাথায় রেখে উপস্থাপিত হয়।
- উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত হয়।
- কিছুটা আন্তঃনির্ভরতা জড়িয়ে থাকে, যাতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি একে অপরের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

- প্রায়শই গণমাধ্যম এবং প্রযুক্তিগুলি কেবলমাত্র দ্রুত যোগাযোগের বদলে একেবারে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়।

প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে চীনে পেপারমেকিং এবং মুদ্রণের উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ প্রযুক্তির শুরু হয়েছিল। কাগজের ব্যবহার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং বই ও পত্রপত্রিকাগুলি যে জায়গাতে তৈরি করা হচ্ছিলো তার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে, 'বিশ্বায়ন' সাধারণভাবে উদারনৈতিক অর্থনীতি বা আমরা যে বিশ্বব্যাপী ভোক্তা পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছি তার একটা নির্দিষ্ট ধাপকেই বোঝায়।

সারা পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পুনর্গঠন এখন কিছুটা হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কর্তৃত্বকে কমিয়ে এনেছে। বিভিন্ন মার্কিন বাণিজ্য সংস্থার মালিকানা ও শেয়ারের অধিকারের উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, অনেক মার্কিন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই অন্যান্য বিভিন্ন দেশের কোম্পানি বা ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাপানী সংস্থা সোনি ১৯৯৯ সালে আমেরিকার কলম্বিয়া এবং ট্রাইস্টার পিকচার্স কিনেছিল; জার্মান কর্পোরেশন বার্টেলসম্যান আরসিএ এবং র্যান্ডমহাউস প্রকাশনা কিনে নেয়; তৎকালীন অস্ট্রেলিয়ান রুপার্ট মারডক ১৯৮৬ সালে টোনটিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স কিনে নিয়েছিলেন; ২০০৮ সালে ভারতীয় মিডিয়া কর্পোরেশন রিলায়েন্স বিগ পিকচার্স স্টিভেন স্পিলবার্গের ড্রিম ওয়ার্কস স্টুডিওর একটি বড় অংশও কিনে নিয়েছে।

৩.৩.৪ উদারীকরণ ও বিশ্বায়নঃ ভারতের প্রেক্ষিতে

১৯৮০-র দশক অবধি ভারত সীমিত আন্তর্জাতিক চুক্তির মধ্যে থেকে নিজস্ব অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন করেছিল। বিশ্বব্যাংকের সাথে চুক্তি করতে অস্বীকার করে, ভারত তৎকালীন অবিভক্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঋণ নিয়ে পরিকাঠামো, তেল অনুসন্ধান ও পরিশোধন, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী খাতের উদ্যোগকে উন্নত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই নীতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কারণ রাষ্ট্র বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতাকে আটকে রেখেছিলো। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজীব গান্ধী প্রশাসন সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক উদারিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যয় বৃদ্ধি এবং তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট দেখা দেয়। এই সময় ভারত সরকার মাত্র দুই সপ্তাহের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকতে থাকতেই বেল-আউটের জন্য বিশ্বব্যাংকের দিকে ফিরে যায়। যে স্বনির্ভরতার পথ গান্ধী ও নেহেরুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা দেখিয়েছিলেন, পরিকাঠামোগত অদলবদলের সাথে সম্পর্কিত শর্তগুলি ভারতকে সেই স্বনির্ভরতার পথ থেকে সরে আস্তে বাধ্য করে। আইএমএফের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার ১৮টি শিল্প ব্যতীত সকলের জন্য লাইসেন্সিং বন্ধ করে দেয়, বহুজাতিক বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনেক সহজ করে দেয় এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলির অনুমোদিত অংশীদারিত্বও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৯১ সালে প্রায় হঠাৎ করে ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন করা হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপর বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়। এইভাবে ভারতে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সূচনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল আইএমএফ।

৩.৩.৫ প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশ্বায়নের প্রভাব

গত পাঁচ বছরে এশিয়াতে সংবাদপত্রের প্রিন্ট সার্কুলেশনে অবিচ্ছিন্নভাবে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে এবং একই সময়ে ভারতে মধ্যে প্রিন্ট সার্কুলেশন বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.২ শতাংশ। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, বিশ্বের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি বয়স্ক, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী অন্তত একটি সংবাদপত্র পড়েন। ভারতে সংবাদপত্রের বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা সাক্ষরতার

বৃদ্ধিরই ফলস্বরূপ। দেশ বিভাগের সময় আমাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ১২ু, যা ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫.৮ু। লিখতে পড়তে পারা এই জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ডিজিটাল মাধ্যমে খবরের অ্যাক্সেসের সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রের পাঠকদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। এটিই আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলির অভূতপূর্ব উত্থানেরও কারণ।

ছবি সৌজন্যে:financialexpress.com

আরএনআই-র প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ভাষার ক্ষেত্রে, হিন্দি দৈনিক খবরের কাগজ বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে, যার দিনে দেড় কোটি প্রচার রয়েছে, তারপরেই জায়গা করে নিয়েছে ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি। আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে প্রচার সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথমে আসে মারাঠি সংবাদপত্রগুলি, তারপরে মালায়ালাম, তামিল, তেলেগু, বাংলা, কন্নড়, গুরুমুখী এবং উড়িয়া। ইন্ডিয়ান রিডারশিপ সার্ভের তথ্য অনুযায়ী সংবাদপত্রগুলির সামগ্রিক পাঠক সংখ্যা ২০১৭ সালে ৪০.৭ কোটি পাঠক থেকে ২০১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২.৫ কোটি পাঠক সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রেরই অনলাইন সংস্করণ রয়েছে। বিশ্বায়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংবাদপত্রে ছবির ব্যবহার, সাপ্লিমেন্ট এর পরিমান ও পেজ-থ্রি সাংবাদিকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞাপনের জন্য সংরক্ষিত জায়গাও ক্রমশ বেড়েছে আরো বেশি মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে।

৩.৩.৬ টেলিভিশনের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

অর্থনৈতিক উদারিকরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সূচনা হয়। এর ফলেই কেবল টেলিভিশন সরকারী টেলিভিশনের সাথে এবং হলিউডের চলচ্চিত্রগুলির সাথে স্থানীয় হিন্দি চলচ্চিত্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। ১৯৯১ অবধি, ভারতীয় টেলিভিশন এবং ফিল্ম বিশ্বের অন্যতম সংরক্ষিত মিডিয়া মার্কেট গঠন করেছিল। রাষ্ট্র পরিচালিত দূরদর্শন

ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না আর আন্তর্জাতিক চুক্তির সীমাবদ্ধতা কার্যকরভাবে বিদেশী চলচ্চিত্রের প্রাপ্যতাকে কমিয়ে এনেছিল। উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ পুরোপুরিভাবে ভারতীয় টেলিভিশনকে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। উন্মুক্ত ভারতীয় বাজারে দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞাপনদাতাদের আর্থিক বিনিয়োগের উপর ভর করে একটিমাত্র সরকার পোষিত চ্যানেল থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যেই ৭০টি টেলিভিশন চ্যানেলে পৌঁছে যায়। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে, রুপার্ট মারডকের নিউজ কর্পরেশনের অংশ হিসাবে হংকং ভিত্তিক স্টার টিভি, ভারতে এমটিভি, বিবিসি, প্রাইম স্পোর্টস এবং স্টার প্লাস (ইংরেজিতে একটি বিনোদন প্রোগ্রামের চ্যানেল)-এর একটি প্যাকেজ চালু করেছিল। বিশেষ করে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ বিষয়ে আগ্রহ এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাপ্রবাহে আগ্রহী হয়ে, কেবল টেলিভিশনের প্রতি আগ্রহ ইংরেজী ভাষায় সাবলীল এলিটদের মধ্যে দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল।

১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে, জি টিভি হিন্দি-ভাষায় প্রোগ্রামিং আরও বাড়ানোর জন্য একটি কেবল টেলিভিশন প্যাকেজ চালু করেছিল, যা বিদেশী চ্যানেলগুলির সংকীর্ণ সীমার বাইরে কেবলটিভি দেখাকে প্রসারিত করে। অল্প সময়ের মধ্যেই কেবলটিভির সম্প্রসারণ অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। ১৯৯১ সালে, এটি তিন লক্ষ্য বাড়িতে পৌঁছতো; ১৯৯৪ সালে এটি ১.২ কোটি বাড়িতে পৌঁছেছে; ১৯৯৯ সালে, এটি ২.৪ কোটি বাড়িতে পৌঁছেছিল। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে ৯০২ টি বেসরকারি স্যাটেলাইটে চ্যানেলের অনুমতি দেওয়া আছে ভারতে আর ১৫ কোটি বাড়িতে কেবল ও স্যাটেলাইটে টিভির সংযোগও আছে। ২০১৯ সালের ফিকি রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে তিন ভাগের দুইভাগ বাড়িতেই টিভি আছে। উদারীকরণের নিয়ম মেনে 'বাজারের উপর অধিক গুরুত্ব' এবং 'রাষ্ট্রের সীমিত হস্তক্ষেপ' নীতি ব্যবহার করে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও গণমাধ্যমকে আমূল রূপান্তরিত করা হয়েছিল, যা বিশ্বায়নের সহায়ক । সবেমাত্র উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া বিশাল বাজারটি ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন এবং ব্রডকাস্টারদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল কেননা ভারতের সম্প্রসারণশীল কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, ক্রমবর্ধমান ভোক্তা শ্রেণী ও বিদেশী দ্রব্যের জন্য উন্মুক্ত পণ্য-বাজারের অংশীদার হতে পারবে। ১৯৯৯ সালের মধ্যে এ দেশে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়, যা বিশ্বের ২০টি শীর্ষ দেশের মধ্যে চলে আসে। তবে, দূরদর্শন কিন্তু উদারীকরণের পরে বাজারের প্রতিযোগিতার তীব্রতা বুঝতে যথেষ্ট দেরি করেছিল। যদিও দূরদর্শন এখনও সর্বাধিক মানুষের বাড়িতে পৌঁছয় এবং ধনী ও গরিব উভয়ের কাছেই এটা সহজলভ্য।

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন যেমন একদিকে ভারতের মিডিয়া পরিসরকে রূপান্তরিত করেছে, অপরদিকে স্থানীয় স্বার্থ, সংবেদনশীলতা এবং প্রতিরোধ এই রূপান্তরকে মধ্যস্থতা করেছে। বিশ্বায়নের একেবারে গোড়া থেকেই, ছোট আকারের কেবল অপারেটররা, মধ্যমানের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবলমাত্র ২০০টি

বাড়িতে কেবলটিভির সংযোগ দিয়েই তারা অনেকটা লাভ করতে পারেন। স্থানীয় চাহিদা মেটাতে, অল্প দিনের মধ্যেই হাজার হাজার ছোট-বড় কেবল অপারেটর এই ব্যবসা বেছে নিয়েছিল। প্রথম দিকে স্টার টিভির ইংরাজী-ভাষায় অনুষ্ঠান ভারতীয় দর্শককে ততটা টানতে না পারলেও, যখন জি টিভি ১৯৯২ সালের অক্টোবরে হিন্দিতে সম্প্রচার শুরু করে তখন থেকেই কেবল টিভির সম্প্রচার বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অনুষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও জনপ্রিয় ভারতীয় চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের গান সমন্বিত প্রোগ্রামিংই কেবল টেলিভিশনের বৃহত্তম সাফল্য হিসাবে জায়গা করে নিয়েছিল। বিশ্বায়নের রীতি মেনে, স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং হলিউডের ছবিগুলির দৃশ্য, স্টাইল, এবং থিমগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানীয় চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন প্রোডাকশনকে রূপান্তরিত করেছে। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলিতে প্রদর্শিত ভারতীয় সিরিয়ালগুলি আমেরিকান সোপ অপেরার বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা পদ্ধতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল।

৩.৩.৭ চলচ্চিত্র শিল্পের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

যদিও হলিউড ছবির বৃদ্ধি কেবল টিভির মতো অভূতপূর্ব ছিল না, কিন্তু ১৯৯০ এর দশকে ভারতের বাজারে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়া হলিউডের ছবিগুলি ভারতের মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপকে রূপান্তরিত করতে ভূমিকা নিয়েছে। ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় বাজার হয়ে ওঠার কারণেই হলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি হলিউডের ফিল্মগুলির ভারতীয় বাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা দীর্ঘকাল ধরে সীমাবদ্ধ রেখেছিলো। অপরদিকে সাধারণ দর্শকদেরও বিদেশী চলচ্চিত্রগুলির প্রতি উৎসাহের অভাব ছিল, কেননা যার মধ্যে গান এবং একশনের মতো জনপ্রিয় উপাদানগুলির অভাব ছিল। তবে, অর্থনৈতিক উদারিকরণের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ১৯৯১ সালেই মুম্বাই এবং অন্যান্য মহানগরে বেশ কিছু হলিউড ছবি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। নব্বুই দশকের মাঝামাঝি সময়ে থেকেই হলিউডের ছবিগুলি হিন্দিতে ডাবিং করা শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং জুরাসিক পার্কের ডাব সংস্করণটি ভারতীয় শহরগুলিতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল। ১৯৯৫ সালে, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স-এর মত ডিস্ট্রিবিউটররা আশাবাদী ছিল যে হলিউডের ছবিগুলির জনপ্রিয়তা ক্রমশ আরো বাড়বে এবং বিদেশী চলচ্চিত্রগুলি ভারতীয় শহরগুলিতে আরও ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হয়। তবে হিন্দি চলচ্চিত্রগুলি নিজেকে বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমশ পরিবর্তন করে, ক্রমবর্ধমান শহুরে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা এবং ভোক্তাবাদকে সামনে রেখে হলিউডের বাজার দখলের চেষ্টাকে আটকে দিতে পেরেছিলো।

ছবি সৌজন্যে-softpowermag.com

রাষ্ট্রের নীতিগত উদ্যোগের সাথে মিডিয়া পরিসরের পরিবর্তনগুলি আরও একটি রূপান্তরকে ইন্ধন জুগিয়েছে যা নাটকীয়ভাবে চলচ্চিত্র শিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৯৯ সালে যখন সরকার চলচ্চিত্রকে " শিল্পের মর্যাদা " প্রদান করে তখন চলচ্চিত্র শিল্পও অন্যান্য শিল্পের মতো পরিকাঠামোগত ও আর্থিক সহায়তা পাবার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। পাশাপাশি, সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্মের কাস্টম শুল্ক হ্রাস, রফতানির লাভের উপর সম্পূর্ণ ছাড় ইত্যাদি সুবিধাও দেওয়া হয়। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে, 'চলচ্চিত্রের কর্পোরেটাইজেশন' শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নীতি-পরিবর্তনের মাধ্যমে শিল্প ক্ষেত্রে উদারিকরণ করার সাথে সাথে বিশেষত মুম্বাই, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, হায়দরাবাদ এবং চেন্নাইয়ের শহরগুলিতে একক পর্দার সিনেমাহলগুলি প্রতিস্থাপন করে মাল্টিপ্লেক্সগুলি ব্যাবসা শুরু করে দেয়। ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে প্রচার চলচ্চিত্র এবং ফিল্ম স্টুডিওগুলির জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিপণনের পরিসর হয়ে উঠেছিল; জনপ্রিয় ফিল্মের গানগুলি সেল ফোন রিংটোন হিসাবে ডাউনলোড করার মতো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিলো। টেলিভিশন এবং রেডিওতে আগ্রাসী বিজ্ঞাপন দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল; টিকিটের মূল্য দ্রুততার সাথে বেড়েছে; এবং তারকারা সংবাদমাধ্যম সাক্ষাৎকার, এবং প্রচারের জন্য নিজেকে আরও বেশি করে তুলে ধরেছিলেন। বিশ্বায়নের পটভূমিতে প্রিন্ট, ফ্লাইয়ার, মোবাইল ফোন, মিউজিক ভিডিও, স্ট্রিমিং সাইটস, সিডি আকারে হাজার হাজার মিডিয়া অবজেক্টগুলি বলিউডকে কেন্দ্র করে একটা " উন্মাদনা " তৈরি শুরু করেছিলো, যা এখনও চলেছে। জনপ্রিয় ছবিগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে গ্লোবাল এবং লোকাল মিলিয়ে একটা হাইব্রিড সম্পর্কের উপস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে ভারতের পরিবর্তিত সম্পর্ককে চিত্রিত করতে শুরু করে। নব্বইয়ের দশকের অর্থনৈতিক উদারিকরণের পর থেকে প্রবাসী ভারতীয়রা মুম্বাই চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। উন্নত দেশে বসবাসরত ভারতের অভিজাত এবং ধনী ভারতীয়দের বাজারকেন্দ্রিক ভোগবাদী জীবনযাত্রা ছবিতে প্রায়শই চিত্রিত হয়েছে। দর্শকদের এই বিশ্বায়িত বাসনাগুলি ভারতীয়করণ ও স্থানীয়করণের মাধ্যমে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

৩.৩.৮ এফডিআই ও ভারতীয় গণমাধ্যম

বিশ্বায়নের একটি অন্যতম উপকরণ হল বিদেশী অর্থের বিনিয়োগ। ১৯৫৫ সালের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে প্রিন্ট মিডিয়াতে বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি গৃহীত হয়নি। তবে সেই সময় বেশিরভাগ প্রকাশক তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি কারণে তাদের অন্যান্য ব্যবসাগুলি থেকে সংবাদপত্র চালানোর মতো উদ্বৃত্ত আয় তখন ছিল। তবে নব্বুই-এর দশকের গোড়ার দিকে যখন বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে তখন বৈদেশিক মূলধনকে মঞ্জুরি দেওয়ার আবেদন পুনরায় শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে, যখন এবিপি ফিনান্সিয়াল টাইমসের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের পরিকল্পনা করে সরকারকে একটি প্রস্তাব দেয় তখন থেকেই প্রিন্টে বৈদেশিক অর্থের অনুমতি দেওয়ার বিতর্কটি আবার শুরু হয়েছিল। অবশেষে অনেক প্রকাশকের চাপের মধ্যে দিয়ে সরকার ২০০২ সালের জুন মাসে ২৬ শতাংশ এফডিআই বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয়। তবে যেহেতু এইসময় অনেকগুলি বিদেশী বিনিয়োগের উপর অনেক রকম বিধিনিষেধ ছিল, সেই জন্যই খুব বেশি বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হননি। তবে এই নিয়মকানুন ২০০৫ সালে অনেক শিথিল হয়ে যাবার পর ভারতীয় গণমাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগের দ্বার খুলে যায়।

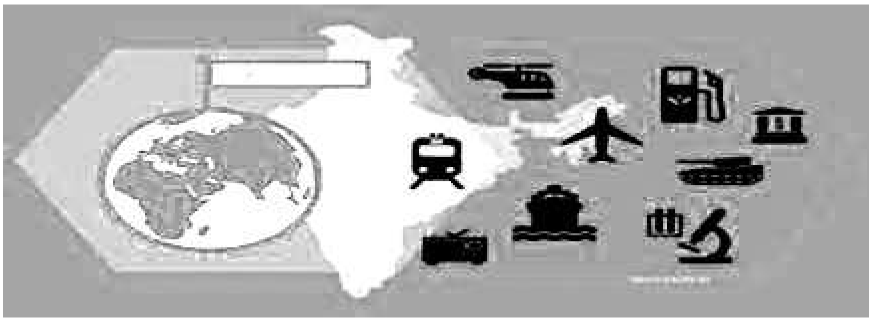

ছবি সৌজন্যে: factly.in

অনেকগুলি ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্টভাবে, ১০০ শতাংশ অবধি বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি রয়েছে, যেমন চলচ্চিত্র শিল্পে; আবার রেডিওতে ২০ শতাংশ অবধি, সংবাদপত্র ও পত্রিকার ক্ষেত্রে ২৬ শতাংশ অবধি অনুমতি রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশের জার্নাল বা বিশেষ কোনো বিষয় নির্ভর পত্রিকার ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশ অবধি বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি মিলবে। সরকার প্রিন্ট মিডিয়ায় এফডিআই সীমা ২৬ু থেকে বাড়িয়ে ৪৯ু করার প্রস্তাব অনেকদিন ধরেই বিবেচনা করে আসছেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রনালয়ের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি এই পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে। কমিটি এই বিষয়ে নীতিগত উদ্যোগের জন্য সরকারকে একটি রোডম্যাপ দেওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারের নিজস্ব অনুমান অনুসারে, দেশে ৭৮০০০ এরও বেশি নিবন্ধিত সংবাদপত্র রয়েছে, যার বেশিরভাগই স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত, স্বল্প প্রচারের স্থানীয় সংবাদপত্র। কিছু মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রিন্ট মিডিয়ায় আরও এফডিআই যদি চালু হয় তবে এই ছোট, স্থানীয় খবরের কাগজগুলিকে নিরুৎসাহিত করবে। এমনকি ছোট সংবাদপত্রগুলো সংযুক্তি এবং অধিগ্রহণের শিকার হয়ে নিজস্বতা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হারাতে পারে এবং কর্পোরেট স্বার্থ দ্বারা বিদেশী মিডিয়ার পক্ষে চালিতও হতে পারে।

বর্তমানে সরকার ব্রডকাস্ট পরিষেবাগুলিতে এফডিআই সিলিং ৪৯ শতাংশ থেকে ৭৪ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি ভারতের কেবল টিভি সেক্টরকে উৎসাহিত করবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে টিভি সম্প্রচারের বিতরণকে পুরোপুরি ডিজিটালাইজ করার সাথে সাথে, এফডিআই সিলিং বাড়ানো কেবলমাত্র মিডিয়া এবং বিনোদন সেক্টরের বিস্তৃতিই বাড়াবে না বরং এই প্রক্রিয়া, অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করতে পারে। গণমাধ্যমে এফডিআই সিলিং বৃদ্ধি করা কেবল অপারেটরদের জন্যও কিছুটা স্বস্তির, কারণ তাদের আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করার সুযোগ আসবে আরও বিনিয়োগের সাথে সাথেই। ভারতে নিজস্ব ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং নতুন প্রযুক্তির ভিত্তি তৈরি করতে বিদেশী বিনিয়োগ যে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩.৩.৯ সারাংশ

বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের পরে গণমাধ্যম ভারতে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু এখনও মূলত ভারতীয় ভাষায় প্রচারটি অনুষ্ঠানই সিংহভাগ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আবার হলিউডের ফিল্মগুলির উপস্থিতি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে, তবে তারা এখনও বাজারের ১০ শতাংশেরও কম জায়গা পেয়েছে ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা বিদেশী চলচ্চিত্র দেখেন তারা ভারতীয় চলচ্চিত্রও দেখেন। প্রিন্ট মিডিয়া বিদেশে জনপ্রিয়তা হারালেও ভারতে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী প্রভাবগুলির

মধ্যের পার্থক্য এবং স্থানীয় মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে। সামগ্রিকভাবে, বিশ্বায়নের মধ্যে থেকে গণমাধ্যমগুলিকে যেভাবে সাধারণ মানুষ তাদের ব্যাক্তিগত অবস্থান থেকে বোঝেন এবং অনুভব করেন সেগুলি পরস্পরবিরোধী হতে পারে। বিশ্বায়নকে অঞ্চলের ভিত্তিতে, নেটওয়ার্ক, প্রবাহ, বা এক ধরণের ''তরলতা'' বা জাল-এর মডেলের নিরিখে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের প্রভাব বা আমেরিকার প্রভাব হিসাবে বিশ্বায়নকে বুঝতে চাইলে কিন্তু বোঝার মধ্যে গলদ থেকে যাবে।

৩.৩.১০ অনুশীলনী ঃ

১) বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝো? গণমাধ্যম কিভাবে বিশ্বায়নের সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়?

২) মিডিয়া বিশ্বায়নের বৈশিষ্টগুলি কি কি ?

৩) ভারতে উদারীকরণের সাথে বিশ্বায়ন কিভাবে জড়িত?

৪) বিশ্বায়নের ফলে ভারতের প্রিন্ট মিডিয়াতে কি কি পরিবর্তনে এসেছে?

৫) ভারতে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সূচনা কেবল টিভির মাধ্যমেই হয়েছে- তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৬) হিন্দি বানিজ্যিক চলচ্চিত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭) তুমি কি মনে কর যে এফডিআই ভারতীয় গনমাধ্যমে প্রয়োজনীয়? - যুক্তিসহ আলোচনা করো।

৮) টিকা লেখো: (ক) চলচ্চিত্রের কর্পোরেটাইজেশন (খ) সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন (গ) গ্লোবাল ভিলেজ

৩.৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১) মিডিয়া সংস্কৃতি, দীপঙ্কর সিনহা, কলকাতাঃ দেজ পাবলিশার্স, ২০১৪।

২) মিডিয়া পলিসি এন্ড গ্লোবালাইজেশন, পলা চক্রবর্তী, এডিনবরা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬।

৩) গ্লোবালাইজেশন ও দি গ্রাউন্ড, স্টিভ ডার্নে, নিউ দিল্লি: সেজ, ২০০৮।

মডিউল ৩ স্বাধীনতার পরে প্রধান প্রবণতা

একক : ৪ ◻ ভারতে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন শিক্ষার বিকাশ

৩.৪.০ গঠন

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

৩.৪.৩ ভারতে সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৩.৪.৪ গণমাধ্যম-শিল্প ও শিক্ষায়তনিক সম্পর্ক

৩.৪.৫ সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের পরিসরে কর্মসংস্থান

৩.৪.৬ ভারতে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমগুলির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা

৩.৪.৭ সারাংশ

৩.৪.৮ অনুশীলনী

৩.৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৪.১ উদ্দেশ্য ঃ

এই এককে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ভারতবর্ষের পটভূমিতে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন শিক্ষা খুবই সীমিত পরিসর থেকে বর্তমানে শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছে। সাংবাদিকতা শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আলোচনার মাধ্যমে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের পট পরিবর্তনের কারণগুলির উপরও আলোকপাত করা হবে। একই সাথে এই পাঠ্যক্রমগুলিকে যে ধরণের সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাও এই এককে আলোচিত হবে।

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

সাংবাদিকতা শিক্ষা পেশাদারি শিক্ষা হিসাবে স্বীকৃত। সাধারণত বিষয়টি বিভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়ে থাকে, যেমন, সাংবাদিকতা, গণজ্ঞাপন, গণযোগাযোগ, জনসংযোগ, মিডিয়া সায়েন্স এবং মিডিয়া স্টাডিজ। এই নামকরণ অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গণজ্ঞাপনের কোন দিকটির উপর বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন তার উপর নির্ভর করেও দেওয়া হয়ে থাকে। এই কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল শিক্ষার্থীরা এই পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সাংবাদিকতার কোর্স পড়ানো হয় এমন মোট ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের অর্ধেকেরও বেশি কেবল এক বছরের ডিপ্লোমা দিয়ে থাকে এবং প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বিভিন্ন কোর্সের শিরোনামের অধীনে স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরাল ডিগ্রির জন্য গবেষণারও সুযোগও ইদানিং খুলে দিয়েছে।

ছবি সৌজন্যে-massmediacareer.com

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রম পড়ানো হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে সম্প্রচার জ্ঞাপন, গ্রামীণ সাংবাদিকতা, কৃষি সাংবাদিকতা, ডিজিটাল মিডিয়া, মোবাইল সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান সাংবাদিকতার মতো বেশ কিছু নতুন ধরণের বিষয় কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের ব্যাবহারের ব্যাপকতার ফলস্বরূপ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মোবাইল সাংবাদিকতার মতো পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। আবার শিল্প, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, শেয়ার বাজার এবং মিডিয়াগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক বিবেচনা করে সাংবাদিকতার আরেকটি ধারা, অর্থাৎ ব্যবসায়িক সাংবাদিকতাও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এইরকম, নানান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমেরও পরিবর্তন এসেছে।

বর্তমানে, বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে (কয়েকটি বেসরকারী ও ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় সহ) প্রায় তিনশোটি সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ বিভাগ সাম্মানিক স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমফিল, ডক্টরাল এবং স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালনায় নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়াও অর্ধ-সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগের বিভিন্ন শাখায় ডিপ্লোমা এবং শংসাপত্র দিচ্ছে। গত এক দশকের আরও একটি বৈশিষ্ট হ''ল বিভিন্ন বেসরকারী ও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, স্নাতক স্তরের কলেজগুলিতেও সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সেলফ-ফাইন্যান্সড কিংবা বৃত্তিমূলক কোর্সও পড়ানো হচ্ছে। এগুলি সমস্তই সাংবাদিকতার তাত্ত্বিক ভিত্তির সাথে হাতে-কলমে দক্ষতার দিকগুলিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে প্রিন্ট, বৈদ্যুতিন জনসংযোগ, বিজ্ঞাপন, ফিল্ম, মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, মিডিয়া আইন এবং নীতিশাস্ত্র ইত্যাদিতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালাইজড হিসাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী প্রত্যেক বছর পাস করছে।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশের জন্য সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ শিক্ষার গুরুত্ব এবং সাংবাদিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রম সামাজিক বিকাশকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যকেও নির্দিষ্ট করেছে। সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ শিক্ষা পেশাদারিত্বের বোধ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, মূলত চারটি প্রধান কারণে: এগুলি হলো:

(ক) কর্মজীবী সাংবাদিকরা ক্রমশ আরও সংগঠিত হয়েছেন;

(খ) সাংবাদিকতায় স্পেশালাইজড শিক্ষার গুরুত্বা বেড়েছে;

(গ) গণযোগাযোগের ও সাংবাদিকতার ইতিহাস, সমস্যা এবং কৌশলগুলি বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সহজ-লভ্যতা, এবং

(ঘ) সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্রমবর্ধমান অনুভূতি। যে কারণে আদর্শবাদী উদ্দেশ্যগুলি আধুনিক ভারতীয় সাংবাদিকতার বিকাশেও অনেক অবদান রেখেছে।

৩.৪.৩ ভারতে সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভারতে, সাংবাদিকতার শিক্ষার সূচনা হয় ১৯৪১ সালে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে (বর্তমানে পাকিস্তানে) প্রয়াত অধ্যাপক পি.পি. সিং-এর পৃষ্ঠপোষকতায়। সান্ধ্যকালীন পার্ট-টাইম এক বছরের সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স হিসাবে কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমটি চালু হয়েছিল। তবে লাহোরের সাংবাদিকতা বিভাগটি সাত বছর পর ১৯৪৮ সালে নয়াদিল্লিতে চলে আসে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে এই সাংবাদিকতা বিভাগটি দিল্লিতে পনেরো বছর ধরে চালু ছিল। পরে এটি ১৯৬২ সালে চন্ডীগড়ের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালে থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাদ্রাস, কলকাতা, মহীশুর, নাগপুর এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাংবাদিকতায় আরও পাঁচটি একাডেমিক প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনকে তার পাঠ্যক্রমের বিষয় হিসাবে অন্তর্গত করে। এর ঠিক পরেই ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (অন্ধ্র প্রদেশ) এবং নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় (মহারাষ্ট্র)-এ সাংবাদিকতার পাঠক্রম শুরু হয়। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় সাংবাদিকতার পাঠক্রম।

সাংবাদিকতা শিক্ষার একেবারে প্রথমদিকে বেশ কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষার্থী যারা সাংবাদিকতায় উচ্চতর পড়াশুনার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন, তাঁরা দেশে ফিরে এসে পাঠ্যক্রম পুনর্বিবেচনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনকে তাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে রয়েছে - পুনা বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেরহামপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়, গাড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়, মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, সাগর বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়। একই ভাবে ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আরও অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, মঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়, কুভেম্পু বিশ্ববিদ্যালয়, তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সিমলা বিশ্ববিদ্যালয়, অন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আন্না বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি আঞ্চলিক মিডিয়া, সরকারী ও বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সাথে মিল রেখে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিগ্রি কার্যক্রম শুরু করে।

ছবি সৌজন্যে-Google

ভারত সরকার ১৯৬৫ সালে নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনসঞ্চার সংস্থান বা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন প্রতিষ্ঠা করেন মূলত জাতীয় উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে সাহায্য করার জন্য। ১৯৬৫ সালে ইউনেস্কোর সহায়তায় নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যাস কমিউনিকেশন (আইআইএমসি) প্রতিষ্ঠা দেশে মিডিয়া এবং যোগাযোগ শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদানকে চিহ্নিত করেছে। ইনস্টিটিউটটি বর্তমানে একাধিক স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, উন্নয়ন সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা, ও একাধিক শর্ট-টার্ম কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এগুলি ছাড়াও সরকারী মিডিয়া কর্মীদের সুবিধার জন্য সময়ে সময়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এবং রিফ্রেশার্স কোর্সগুলিও আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক ও অন্যান্য মিডিয়া পেশাদারদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়ার জন্য ১৯৬৩ সালে প্রেস ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি নিয়মিতভাবে সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্স আয়োজন করে। ভোপালের মাখনলাল চতুর্বেদী রাষ্ট্রীয় পত্রকারিতা এবং সঞ্চার বিশ্ববিদ্যালয়, প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা, কবি ও সাংবাদিক মাখনলাল চতুর্বেদীর নামানুসারে, ১৯৯০ সালে মধ্যপ্রদেশের আইনসভার নির্দেশ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি সাংবাদিকতার জন্য এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বিবেচিত হয়। মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, গ্রাফিক্স, বিনোদন যোগাযোগ এবং বিজ্ঞাপন ও এম.বি.এ প্রোগ্রাম সহ পঁচিশটি মিডিয়া বিষয়ক একাডেমিক প্রোগ্রাম প্রদান করে এমন সাংবাদিকতার ও জ্ঞাপনের আটটি বিভাগ রয়েছে।

এর পাশাপাশি, বিপুল সংখ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সারাদেশে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় একাধিক কোর্স চালিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো, ভারতীয় বিদ্যা ভবন, সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউট অফ কমিউনিকেশন (মুম্বাই), সিম্বিওসিস ইনস্টিটিউট অফ ম্যাস কমিউনিকেশন (পুনে), এশিয়ান কলেজ অফ জার্নালিজম (চেন্নাই), মণিপাল ইনস্টিটিউট অফ কমিউনিকেশন (মণিপাল) এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ জার্নালিজম অ্যান্ড নিউ মিডিয়া (ব্যাঙ্গালুরু)। ভারতে বর্তমানে প্রায় কয়েকশো বিশ্ববিদ্যালয়, কুড়িটির বেশি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকশো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিবেদন, সম্পাদনা, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, মুদ্রণ, ডিজাইনিং, বিজ্ঞাপন, জনসংযোগ এবং অন্যান্য বিষয়ে বার্ষিক কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কৃষি যোগাযোগ, সম্প্রসারণ শিক্ষা এবং উন্নয়ন যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ তাদের পরিকাঠামো প্রশিক্ষণের সাথে তাল মিলিয়ে আরও উন্নত করেছে।

ভারতে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন শিক্ষার আট দশক পার হয়েছে, এই সময়কালে, সাংবাদিকতা শিক্ষা সরবরাহকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, গুণমান এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় পেশাদারি প্রশিক্ষণ থেকে তাত্ত্বিক আলোচনা ও গবেষণা, পশ্চিমি ধাঁচে শিক্ষা থেকে ক্রমশ ভারতীয় বিষয়, বৈশিষ্ট ও প্রবণতা সম্পর্কে ঝোঁক, সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ শিক্ষাকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছে। প্রাথমিক ভাবে খুব কম লোকই ভাবতে পেরেছিলেন যে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বা তাদের আদৌ প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এমনকি গণমাধ্যমের মালিকরাও বিশ্বাস করতেন যে "গণযোগাযোগকারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করা যায় না"। তারাও এই ভুল ধারণার কারণে প্রথমদিকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণকে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেনি।

৩.৪.৪ গণমাধ্যম-শিল্প ও শিক্ষায়তনিক সম্পর্ক

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের কার্যক্রমগুলি নিম্নলিখিত কাঠামোর মধ্যে বিভক্ত করা যেতে পারে:

১. বিশ্ববিদ্যালয়, তাদের অনুমোদিত কলেজ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান: ক্রমশ এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ার খরচ অনেকসময় বেশি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচের থেকে।

২. মিডিয়া-সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান: সাম্প্রতিক সময়ে টাইমস স্কুল অফ জার্নালিজম থেকে শুরু করে এশিয়ান কলেজ অফ জার্নালিজম (দ্য হিন্দু), মনোরমা স্কুল অফ কমিউনিকেশন (মালায়ালাম মনোরাম), ইনাড়ু গ্রুপ, থান্টি গ্রুপ ইত্যাদি। এমনকি টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলগুলিও তাদের নিজস্ব কোর্স চালু করছে এবং তাদের কয়েকজন সুপরিচিত অ্যাঙ্কর এবং নিজস্ব ব্যবসায়িক আগ্রহের দ্বারা স্কুলগুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

৩. অন্যান্য বেসরকারী উদ্যোগ যেমন পুনের সিম্বাইসিস, ক্রাইস্ট কলেজ, মনিপাল ইনস্টিটিউট এবং মুম্বইয়ের সোফায়া কলেজ এই সুপরিচিতদের মধ্যে রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাদানের পরিকাঠামো অত্যন্ত উন্নত মানের হয়।

মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি বা গণমাধ্যম-শিল্প ও শিক্ষায়তনিক সম্পর্ককে কিভাবে আরো সুদৃঢ় করা যায় সেই বিবেচনাই সাংবাদিকতা শিক্ষার সংস্কারের পরিকল্পনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। যদিও গণমাধ্যম শিল্পের সাথে যুক্ত পেশাদাররা ক্লাসরুমগুলিতে মাঝে মধ্যে বিশেষ বক্তব্য রাখার জন্য আসেন কিন্তু তাঁরা সামগ্রিকভাবে ভারতে সাংবাদিকতা শিক্ষার গঠনে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশ নেননি। তদুপরি, সমস্ত পেশাদাররাই তাদের প্রয়োগিক দক্ষতা বা অভিজ্ঞতাকে সবসময়ে ক্লাসরুমের পক্ষে উপযুগি তাত্ত্বিক কাঠামোতে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নন, যা সাংবাদিকতা, একাডেমিক বিষয় হিসাবে প্রায়শই দাবি করে। অপরদিকে, সব সাংবাদিকতার শিক্ষকদেরই যে মিডিয়ায় কাজ করার বা হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকবে তাও আশা করা যায় না, যদিও সেসব বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট তাত্ত্বিক ধারণা থাকতেই পারে। এই কারণেই, ভারতে সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ শিক্ষাব্যবস্থাটি পক্ষে কোন পথ সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত হাতে কলমে শিক্ষার পথ নাকি একাডেমিক বা তাত্ত্বিক পড়াশোনার পথ তা নির্ধারণ করা সহজ হয়নি।

পি সাইনাথ (২০০১) এবং প্রসূন সোনওয়ালকর (২০০২) তাঁদের লেখায় ব্যক্ত করেছেন যে ভারতে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি ক্রমশ বৃহৎ কর্পোরেটের মতো হয়ে উঠছে ফলে পশ্চিমি মিডিয়া"র 'মারডকাইজেশন' এর সাথে পাল্লা

দিয়ে সাংবাদিকতা এবং গণসংযোগ শিক্ষার পাঠ্যক্রমও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সাংবাদিকতা শিক্ষা ইন্ডাস্ট্রিকে আলিঙ্গন করার জন্য একাডেমিক দৃষ্টিকোণ ত্যাগ করার প্রচণ্ড চাপের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বেশ কিছু মিডিয়া-শিক্ষাবিদদের মতে কেবলমাত্র সীমিত অর্থে ইন্ডাস্ট্রির চাহিদাই পূরণ করতে পারে এমন দক্ষতার উপর মনোনিবেশ করার চেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যাগুলি বোঝার জন্য বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতার চর্চার উপর জোর দেওয়া উচিত।

৩.৪.৫ সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের পরিসরে কর্মসংস্থান

অসংখ্য প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত পাঠ্যক্রমগুলি পড়ে পাশ করার পর স্নাতক এবং ডিপ্লোমাধারীরা ঠিক কোথায় কর্মসংস্থান খুঁজে পাবে তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকে। এর আগে, এটি লক্ষ করা গেছে যে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে বিশেষত খবরের কাগজের দপ্তরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিরও খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা হয়েছে। সাধারণভাবে, সাংবাদিকতার ছাত্রছাত্রীরা রিপোর্টিং এবং ডেস্ক-এর কাজে নিযুক্ত হন। সরকারী ক্ষেত্রে অনেকসময় জনসংযোগের কাজেও সাংবাদিকতার ছাত্রছাত্রীদের নিযুক্ত করা হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিষ্ঠান এই ধরনের চাকরি প্রদান করে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীদের। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) মাধ্যমে অনেক ছাত্র-ছাত্রী অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শনে প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ হিসাবেও নিয়োজিত হয়েছেন। অতীতে অনেক মিডিয়া সংস্থাই সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপনের ডিগ্রি / ডিপ্লোমাকে অন্যতম প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করতে প্রস্তুত ছিল না। এখন অবশ্য, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং একটি ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মিডিয়াতে চাকরির জন্য বিশেষত সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগের ছাত্র-ছাত্রীরাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। পাশাপাশি, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলির প্রসার সংবাদ এবং বিনোদন জগতে আরও অনেক কাজের সুযোগ উন্মুক্ত করেছে। বর্তমান কর্মসংস্থানের হার এবং শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে প্রত্যাশিত বৃদ্ধির বিষয়টি মাথায় রেখে মিডিয়া এবং বিনোদন শিল্পের জন্য ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের একটি প্রতিবেদন অনুমান করেছে যে মিডিয়া এবং বিনোদন শিল্পে মোট কর্মসংস্থান ২০২২ সালের মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষেরও বেশি হয়ে উঠবে। ২০০০ সালের ডটকম বুমের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি সাধারণত সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপনের স্নাতকদের কন্টেন্ট ডেভেলপার হিসাবে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করেছিল। এই চাহিদা মিডিয়া জগতের কয়েকটি সংস্থাকেও সেইসময় আকৃষ্ট করেছিল। এর পাশাপাশি টেকনিকাল রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেও দক্ষতার চাহিদা এই সময় বেড়েছিল।

ছবি সৌজন্যে-educationbhaskar.com

বর্তমানে গণমাধ্যম শিল্পে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলেও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যম শিল্পের সাথে সমান রকম যোগাযোগ স্থাপন করে চলতে পারে না। প্রাক্তনী সমিতিগুলি সম্ভবত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের অভিজ্ঞতা এবং সেই সময়কার কর্মক্ষেত্রের প্রবণতা সম্পর্কে জানাতে পারে, যার ফলে ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটা সেতু নির্মাণ হতে পারে। আবার মিডিয়া পরিবেশে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিকল্প সরবরাহ করছে। ইন্টারনেট-ভিত্তিক মিডিয়াগুলির আধিপত্য ক্রমশ সাংবাদিকতা এবং যোগাযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিউ মিডিয়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে কোর্সগুলি ডিজাইন করতে উৎসাহিত করছে। এমনকি বর্তমানে গবেষণা কার্যক্রমগুলিও ডিজিটাল যোগাযোগ ও নিউ মিডিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের উপরই বেশি করে আলোকপাত করছে।

৩.৪.৬ ভারতে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমগুলির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা

এক সময় এরকম মনে করা হলেও যে সাংবাদিকতা শেখানো যায় না, বর্তমানে সাংবাদিকতা এক সময়কার আনকোরা নতুন বিষয়ের তকমা পেরিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়েছে। আরও মিডিয়া সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি তাদের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের পাঠ্যক্রম নিয়ে প্রচার শুরু করেছে, আর এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নগরকেন্দ্রিক উপস্থিতি দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি সাংবাদিকতা শিক্ষাকে তাদের ব্যবসা এবং উপার্জনের মডেলগুলির সাথে যুক্ত করার পাশাপাশি এটি শিক্ষার্থীদের নেটওয়ার্কিং এবং পেশাদারি যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানেরও সহায়তা করে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ পাঠ্যক্রম তাদের আর্টস ও সোশ্যাল সাইন্স এর পরিধির মধ্যে চিহ্নিত করে এবং শিক্ষার্থীদের সুচিন্তিত ও বিশ্লেষণাত্মক মতামত তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। কেননা সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের শিক্ষা কেবলমাত্র কিছু হাতে-কলমে কাজ করার দক্ষতার উপরই কেবল নির্ভর করে না, বরং সমাজ অর্থনীতি, রাজনীতি থেকে শুরু করে সংস্কৃতি, ক্রীড়া, পরিবেশ, বিনোদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জনের উপরও নির্ভর করে; যার সাথে থাকতে হবে ভাষা জ্ঞান ও সৃজনশীল কিন্তু প্রাঞ্জল ভাবে লেখার ক্ষমতা।

ইউনেস্কো ২০০৭ সালে সাংবাদিকতার জন্য একটি মডেল কারিকুলাম প্রকাশ করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল মূলত সাংবাদিকতার দিকে মনোনিবেশ করা, জ্ঞাপনের দিকে নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমটি একটি টেমপ্লেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ইগনু) তার পাঠ্যক্রমগুলিতে মডেল কারিকুলামের অনেকগুলি সুপারিশকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মডেল পাঠ্যক্রমের ভূমিকাতেই এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে সাধারণভাবে সাংবাদিকের মূল লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে সমাজসেবা করা। মডেল কারিকুলামে এটিও বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজে সাংবাদিকতার অধ্যয়নকে পেশাদার প্রশিক্ষণের বুনিয়াদ হিসাবে দেখা উচিত। ২০০০ সালের মার্চ মাসে ইউনেস্কো সমর্থিত একটি আলোচনাসভায় দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকতাবিদরা এই মডেল কারিকুলাম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরাও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে উন্নয়নশীল দেশে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমে ইউনেস্কোর সুপারিশগুলো যতটা সম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত।

ভারতে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমগুলির একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হ'ল পাঠদান এবং শেখার সাথে জড়িত সংস্থানগুলি অনেকসময়ই ভারতের নিরিখে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনগুলি প্রতিফলিত করে না। ১৯৯০ এর দশকে সার্কভুক্ত দেশগুলির

পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল যে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক পুস্তক, গবেষণাপত্র ও অধ্যয়নের জন্য জরুরি অন্যান্য উপাদানের যথেষ্ট অভাব আছে। তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে, এবং আধুনিক শিক্ষাবিদদের দ্বারা রচিত এবং শীর্ষস্থানীয় প্রকাশক দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থে ও জার্ণালে সমকালীন উপাদানগুলি উপলব্ধ হয়ে উঠছে। যেমন, সেজ এবং অক্সফোর্ডের মতো শীর্ষস্থানীয় প্রকাশকদের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও জার্নাল রয়েছে যা বিশেষত ভারতীয় গণমাধ্যমের সাথে সম্পর্কিত। তবে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত বই ও জার্নালের অভাব এখনও ভীষণরকম ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একদিকে সাংবাদিকতা মূলত পেশাদারি দক্ষতার উপর জোর দেয়, অপরদিকে জ্ঞাপন প্রক্রিয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ-এর উপর গুরুত্ত্ব দেয়। অনেক গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের মতে, এই দুটি অভিমুখ ভিন্ন হলেও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ই দুটি অভিমুখই সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত করার প্রচেষ্টা করার ফলে অনেকসময় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকর্তাদের প্রত্যাশাগুলি সাংবাদিকতার ছাত্র-ছাত্রীরা পূরণ করতে পারে না।

৩.৪.৭ সারাংশ

যদিও ভারতীয় সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ শিক্ষা প্রায় আট দশক ধরে গড়ে উঠেছে, তবে এটি এখনও নানান পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমশ নিজেকে পাল্টে পাল্টে নিচ্ছে। একেবারে প্রথমদিকে, সাংবাদিকতা শিক্ষা বলতে বোঝাতো কেবলমাত্র রিপোর্টিং, সম্পাদনা এবং ডিজাইনিংয়ের দক্ষতা অর্জন করা। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের শিক্ষা এখন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োজন-ভিত্তিক, ক্ষেত্র-ভিত্তিক, বৈজ্ঞানিকভাবে-পরীক্ষিত প্রক্রিয়ায় গতিশীল আধুনিক ভোক্তা এবং ক্লায়েন্টদের চাহিদা ও প্রবণতার প্রতিফলন। উদারীকরণের পরে, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল এবং সম্প্রচার সংস্থাগুলির উত্থান গণযোগাযোগ শিক্ষার চাহিদা অনেকগুন বাড়িয়ে তোলে। তবে এখনও সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের অধ্যয়ন বেশ কয়েকটি সমস্যার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে মূল হলো, আঞ্চলিক ভাষায় বই ও গবেষণা পত্রের অভাব। মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগের অভাব, এবং পাঠ্যক্রম চলাকালীন ইন্টার্নশীপ বা কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার অভাব। দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকার পর, ভারতে সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ কোর্সগুলি বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মসংস্থানের পথ অনেকাংশে সুগম করেছে।

৩.৪.৮ অনুশীলনী:

১) আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমেরও পরিবর্তন এসেছে - ব্যাখ্যা করো।

২) ভারতে সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩) সারাদেশে সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান কি?

৪) সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের কার্যক্রমগুলি কি কি ভাগে ভাগ করা যায়?

৫) মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি ও সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যের ব্যবধান সম্পর্কে তোমার মত কি? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

৬) সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৭) ভারতে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করো।

৮) টীকা লেখো: (ক) আইআইএমসি (খ) ইউনেস্কোর মডেল কারিকুলাম (গ) মিডিয়া এবং বিনোদন শিল্পে কর্মসংস্থান।

৩.৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি :

১) জার্নালিজম এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, সঞ্জয় পার্থসারথি ভার্থার, জার্নালিজম এন্ড মাস কমুনিকেশন এডুকেটর, সংখ্যা ৭২(৩), ২০১৭, পৃ: ২৮৫ - ২৯৬।

২) জার্নালিজম এডুকেশন এন্ড টেক্সট বুকস ইন সার্ক কার্ন্টিজ, কে.ই. এপ্পান, আইএএমসিআর রিপোর্ট, ১৯৯১।

৩) মাস কমুনিকেশন ইন ইন্ডিয়া, কেবল জে. কুমার, জাইকো পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪।

৪) জার্নালিজম এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, এস.আর.মুপ্পিড়ি, মিডিয়া এশিয়া, সংখ্যা ৩৫(২), পৃ: ৬৭-৮৩।

৫) জার্নালিজম এন্ড মাস কমুনিকেশন এডুকেশন: এন এসেসমেন্ট, বি.পি. সঞ্জয়, এশিয়া প্যাসিফিক মিডিয়া এডুকেটর, সংখ্যা ২২(১), পৃ: ১১৫ -১২৬।

মডিউল ৪ - ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস

একক : ১ □ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ- প্রধান চলচ্চিত্র প্রযোজনা কেন্দ্র - বোম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা ইত্যাদি

৪.১.০ গঠন

৪.১.১ উদ্দেশ্য

৪.১.২ ভারতীয় সিনেমার যাত্রাপথ

৪.১.৩ দাদাসাহেব ফালকে

৪.১.৪ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)

৪.১.৫ কাহিনীনির্ভর চলচ্চিত্র এবং ম্যাডান

৪.১.৬ অন্যান্য স্টুডিও

৪.১.৭ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

৪.১.৮ স্টুডিও সিস্টেম

৪.১.৮.১ সবাক সিনেমা

৪.১.৮.২ নিউ থিয়েটার্স

৪.১.৯ সারাংশ

৪.১.১০ অনুশীলনী

৪.১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করবো সেই গুলি হলো:

ভারতীয় সিনেমার যাত্রাপথ

দাদাসাহেব ফালকে

ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)

কাহিনীনির্ভর চলচ্চিত্র এবং ম্যাডান

অন্যান্য স্টুডিও

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

স্টুডিও সিস্টেম

৪.১.২ ভারতীয় সিনেমার যাত্রাপথ

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আমল থেকেই সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ হিসেবে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। সংবাদপত্র, বেতার ইত্যাদির পাশাপাশি গণমাধ্যমের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। আধুনিক বিশ্বে সাংস্কৃতিক চর্চার সামাজিক গুরুত্বের সাথে তাল মিলিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে এটি কেবলমাত্র সংস্কৃতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে গড়ে ওঠেনি, সমাজের দর্পণ এবং পরিবর্তনের সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে, ইতিহাসের উৎস ও আলোচ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছে। ১৮৯৮ সালে জনৈক আমেরিকান ব্যবসায়ী চিত্র প্রদর্শনের জন্য কোলকাতায় আসেন। তাঁর কাছ থেকেই এক বাঙালি আলোকচিত্র শিল্পী হীরালাল সেন একটি ফিল্ম প্রজেক্ট ক্রয় করেন। এই প্রজেক্ট দিয়ে তিনি কোলকাতার আশপাশে ও ভোলার এসডিও ডাক বাংলার সন্নিকটে কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। হীরালাল সেন এই বিদেশী কলাকুশলীদের সহকারী হিসেবে প্রথম কাজ শুরু করেন এবং তার কাছ থেকে কিছুকাল কাজ শেখার পর তিনি নিজেই পরবর্তীতে একটি ক্যামেরা তৈরি করেন এবং ওই ক্যামেরা দিয়েই তিনি প্রথম ছবি তৈরির কাজ শুরু করেন। সে সময় 'আলিবাবা' নাটকের কয়েকটি দৃশ্য তিনি গ্রহণ করেন। নাটকের মাঝখানে এই দৃশ্যগুলো দেখানো হতো। এই শটগুলোই একসঙ্গে নিয়ে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র তৈরির প্রয়াস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।হীরালাল সেন ১৯০০ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ৪০টির মতো স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৯১৭ সালে কলকাতায় মারা যাবার আগে পর্যন্ত তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের এভাবেই প্রথম সূত্রপাত হয়। এরই পথ বেয়ে পরবর্তীতে ভারতের প্রথম নির্বাক কাহিনী চিত্র তৈরি করেন বোম্বাইয়ের ডিজি ফালকে। ছবিটির নাম ছিল 'হরিশচন্দ্র'। ছবিটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩৭,০০০ ফুট। এটি ভারতীয় প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য নির্বাক ছবি। ১৯১৩ সালে মোম্বাইয়ের করোনেশন সিনেমা হলে 'হরিশচন্দ্র' ছবিটি মুক্তিলাভ করে। এই ছবিতে স্ত্রীর ভূমিকায় পুরুষ শিল্পীদের অভিনয় করতে হয়েছিল। কারণ সেই সময়ে মহিলা শিল্পীদের ছবিতে অভিনয় করাটা রীতিমতো অসম্মানজনক বলে মনে করা হতো। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত দাদাসাহেব ফালকে ২৩টি নির্বাক ছবি তৈরি করেন।

ঔপনিবেশিক ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম পর্বে বিষয় নিয়ে খুব পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি, মূলত ধর্মীয় কাহিনী নির্ভর চরিত্র তুলে ধরার এক প্রথাগত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। শুরু থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভারতে নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হতো। ইউরোপীয় সংস্কৃতির তথ্যচিত্র নির্মাণের ঘরানা অনুসরণ করেই এদেশে চলচ্চিত্রের পথচলা শুরু হলেও পরবর্তী কালে চলচ্চিত্রের বিষয়গুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে সনাতনী ভারতীয়।

ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র ১৮৯৬ সালে প্রদর্শিত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় উদ্যোগে যে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছিল সেটি হল 'রাজা হরিশচন্দ্র'(১৯১৩) এবং তার নির্মাতা ছিলেন সিনেমাপাগল দাদাসাহেব ফালকে। এই চলচ্চিত্র নির্মাণের সাফল্যে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১৯১৮ সালে 'শ্রীকৃষ্ণ জনম' নামক আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। যার বিষয় ছিল ভারতীয় দেবতা হিসেবে পূজিত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঘিরে গড়ে ওঠা এক প্রতিলৌকিক কাহিনী। প্রকৃতপক্ষে এটা লক্ষ্য ক্রলেই বোঝা যায় ভারতীয় জনজীবনে ধর্মের গুরুতর প্রভাব অনুভূত করেই এই ধরনের সিনেমা নির্মান করা হতো। প্রাথমিক বিদেশী সাহায্যের পর দাদাসাহেব ফালকের হাত ধরে ভারতের চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বদেশী করন ঘটেছিল। পাশাপাশি 'রাজা হরিশচন্দ্র' সিনেমাটির চরিত্র রাজা হরিশচন্দ্রের সততা পরবর্তীকালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। অবিভক্ত ভারতের প্রথম সবাক ছবি আলম আরা' ১৯৩১ সালের ১৪ মার্চ বম্বের ম্যাজিস্ট্রিক সিনেমা হলে মুক্তি পায়। ভারতীয় প্রথম সবাক ছবির পথিকৃৎ 'আলমআরা'র নির্মাতা ছিলেন আরদেশের ইরানী।

বাংলাও পিছিয়ে ছিল না। তৈরি হলো প্রথম নির্বাক কাহিনীচিত্র 'বিল্বমঙ্গল' ১৯১৯ সালে। এই সময় অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)। 'বিলেত ফেরত' (১৯২১) তৈরি করা ছাড়াও ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের সিনেমায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি যা সে সময়ের সাপেক্ষে অভাবনীয় ঘটনা ছিল। আর একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। বাংলা সিনেমার একটি সময়কে প্রমথেশ যুগ বলে অভিহিত করা হয়। ত্রিশের দশকের শুরুতে সিনেমা সবাক হয় বাংলার প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ছিল জামাইষষ্ঠী। এই সময়ে হলিউডের মতো বাংলায় শুরু হয় স্টুডিও সিস্টেম। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও। এর দ্বারা বাংলা সিনেমা যথেষ্ঠ উপকৃত হয়। জনপ্রিয়তায় সিনেমা তখন তুঙ্গে ছিল। কিন্তু ধরে নেওয়া হয় দুর্বল পরিচালনা, আত্মপ্রচারের লোভ ও অপেশাদারিত্বের ফলে চল্লিশের দশকের পর স্টুডিও সিস্টেমের পতন হয়।

৪.১.৩ দাদাসাহেব ফালকে

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল ১৯১৩। এই বছর ভারতবর্ষের কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' নির্মিত হয়। নির্মাণকারী পরিচালক ধুন্দিরাজগোবিন্দ ফালকে, তিনি দাদাসাহেব ফালকে নামেই অধিক পরিচিত। পৌরাণিক এই কাহিনীচিত্রে চিত্রশিল্প, সঙ্গীত এবং নাটকের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটেছিল। দাদা সাহেব ফালকে তাঁর পূর্বসূরী চিত্রশিল্পী রাজা রবি বর্মার চিত্রশৈলী থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং ছবির চরিত্রের অর্থাৎ রাজা হরিশচন্দ্রে রাজা রবি বর্মার প্রভাব স্পষ্ট। এছাড়া তৎকালীন মারাঠি নাট্যমঞ্চও ফালকে-কে প্রভাবিত করেছিল। রাজা হরিশচন্দ্র ১৯১৩ সালে নির্মিত হলেও এইরকম ছবি করার কথা ফালকে প্রথম ভেবেছিলেন ১৯১০ সালে। সেই সময় 'লাইফ অফ ক্রাইস্ট' নামে একটি ছবি দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হন। ঠিক এইরকমই ভারতীয় পুরাণের ভিত্তিতে পাওয়া চরিত্রের ওপর একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় চলচ্চিত্র তৈরি করবেন স্থির করেন।

চলচ্চিত্রের পেশায় আসার আগে ফালকে বিভিন্ন রকম পেশায় যুক্ত ছিলেন। ১৮৬০ সালে মহারাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ফালকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে জে. জে. স্কুল অফ আর্ট এর ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। সেখানের শিক্ষা শেষে তারপর বরদার কলাভবনে যোগ দেন। দুটি ক্ষেত্রে শিক্ষনের ফলে দাদাসাহেব ফালকে শিল্পকলা, ছাঁচ নির্মাণ, লিথোগ্রাফ, স্থাপত্য বিদ্যা এবং ফটোগ্রাফিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এই সময় মঞ্চাভিনয়ে যোগ দেন। তিনি জর্জ মেলিয়ের মতন যাদুবিদ্যা রপ্ত করেছিলেন যা তাঁর মতে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। রাজা হরিশচন্দ্র ১৯১৩ সালের ৩রা মে করোনেশন সিনেমাটোগ্রাফ—এ মুক্তি লাভ করে। রাজা হরিশচন্দ্র অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের মানুষ এই প্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় বিষয়বস্তু নির্ভর একটি ভারতীয় ছবি দেখতে পেলেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তারা ছবিটির সাথে একাত্ম বোধ করেন। ১৯১৭ সালে ফালকে হিন্দুস্তান কোম্পানি তৈরি করেন। এই কোম্পানির প্রথম ছবি ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ জনম' (১৯১৮)। ১৯১৯ সালে তৈরি হয় 'কালীয়দমন'। এই ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ফালকের মেয়ে মন্দাকিনী। ফালকে মোট ১২০টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তার শেষ ছবি 'গঙ্গাবতরণ'। ১৯৪৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দাদাসাহেব ফালকে পরলোকগমন করেন।

৪.১.৪ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)

ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর জন্ম ১৮৯৩ সালের ২৬ মার্চ, কলকাতায়। খুবই শিক্ষিত পরিবারে জন্ম হয়েছিল ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর। ছেলেবেলাতেই ধীরেন্দ্রনাথ পড়াশোনার জন্য চলে যান শান্তিনিকেতনে এবং সেখানে বালক বয়সে সংগীত, অঙ্কন, অভিনয় এবং যন্ত্রবাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শান্তিনিকেতনে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় কবির সাথে অভিনয় করেছিলেন তিনি। কবি হয়েছিলেন 'বাল্মিকী' এবং ধীরেন্দ্রনাথ হয়েছিলেন 'মায়া'। শান্তিনিকেতনে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন, এরপর তিনি সরকারি আর্ট স্কুল থেকে স্নাতক হন।

১৯১৬ সালে ধীরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদের নিজাম আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হন। কিন্তু ১৯১৮সালে কর্মস্থলে ইস্তফা দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। ফিরে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্র নির্মাণ করা। তিনি তৈরি করেন ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি। তাঁর সাথে যোগ দেন ম্যাডান কোম্পানির তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার নীতিশ লাহিড়ী। ধীরেন্দ্রনাথ তৈরি করেন প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের বাংলা ছবি 'বিলেত ফেরত'। ১৯২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ভবানীপুরে রসা থিয়েটারে মুক্তি লাভ করে। এই ছবিটি একটি সামাজিক ছবি। ভারতীয়দের অন্ধভাবে ইউরোপীয় আচার ব্যবহার নকল করাকে বিদ্রুপ করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ এই ছবিতে। ছবির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। এছাড়া ছবির কাহিনীকার এবং পরিচালকও ছিলেন তিনি। হাস্যভিনেতা হিসেবে প্রথম ছবিতেই খ্যাতি লাভ করেন। ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানির দ্বিতীয় ছবি ছিল 'যশোদা নন্দন'। এই ছবিতে কাহিনীকার ছিলেন নীতিশ লাহিড়ী। তাঁদের তৃতীয় ছবি ছিল 'সাধু কী শয়তান'। কিন্তু এই ছবির নির্মাণকার্য সম্পন্ন হওয়ার আগেই ধীরেন্দ্রনাথ কোম্পানি ত্যাগ করেন।

প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের এবং সামাজিক ছবির নির্মাতা ধীরেন্দ্রনাথ-এর আরেকটি অনস্বীকার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল, তিনি প্রথম শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সিনেমায় অভিনয়ের জন্য নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। নিজের স্ত্রী প্রমিলাদেবীকে 'যশোদা নন্দন' সিনেমায় অভিনয় করিয়েছিলেন। পরের দিকে কন্যা মনিকাকেও সিনেমা নিয়ে এসেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ এর ভাষায় "আমি মেয়েদের যথার্থ শিল্পী হতে আহ্বান জানিয়েছিলাম চলচ্চিত্রের পর্দায়। আমি ওদের মর্যাদা আদায় করে নিতে শিখিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী ঠাকুর বাড়ির মেয়ে, তাকে প্রথমেই নামিয়ে আমি অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছিলাম।" শিল্পের উৎকর্ষতার জন্য শিক্ষিত মেয়েদের সিনেমায় যোগদান একান্ত আবশ্যক।

১৯২২ সালে ধীরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদের গড়ে তোলেন তাঁর লোটাস ফিল্ম কোম্পানি। তাঁর বড় দাদা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম ইঞ্জিনিয়ার। তারই সহায়তায় ধীরেন্দ্রনাথ কোম্পানি গড়ে তোলেন। স্টুডিও যন্ত্রপাতি ক্যামেরা ইত্যাদি অবশ্য কলকাতা থেকে কিনেছিলেন তিনি। লোটাস ফিল্ম কোম্পানির প্রথম ছবি 'ইন্দ্রজিৎ ও লেডি টিচার'। টাইটেল সহ ছবিটি মুক্তি পায় ১৯২২ সালের ১৯ আগস্ট। এটি ছিল ৮ রীলের ছবি। এরপর একে একে তিনি তৈরি করেন 'ম্যারেজ টনিক', 'বিমাতা', 'হরগৌরী', 'বিল্বমঙ্গল', 'সতী সীমন্তিনী' ইত্যাদি। ছবিগুলি তখন হায়দ্রাবাদের লক্ষ্মী সিনেমায় দেখানো হত। ১৯২৯ সালে ধীরেন্দ্রনাথ প্রমথেশ বড়ুয়ার সাথে তৈরি করেন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেড।

৪.১.৫ কাহিনীনির্ভর চলচ্চিত্র এবং ম্যাডান

দাদাসাহেব ফালকের একের পর এক সফল ছবি নির্মাণে ও তাদের জনপ্রিয়তায় ও সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতার চলচ্চিত্রপ্রেমী জে. এফ ম্যাডান ভারতের প্রথম চিত্রগৃহ স্থাপনাকার্যে মন দেন। ১৯১৭ সালে তার প্রথম নির্বাক ছবি "নলদময়ন্তী" মুক্তিলাভ করে। ঠিক এ সময়ই দুজন বাঙালি ব্যবসায়ী চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এরা হলেন অনাদি নাথ বসু ও এন সি লাহিড়ি। কলকাতার প্রথম চিত্রগৃহ নির্মাণ করেন জে.এফ ম্যাডান। চিত্রগৃহটির নাম ছিল 'এনফিনাস্টোন পিকচার প্যালেস' যা পরে মিনার্ভা সিনেমা হল নামে পরিচিত হয়।

ভারতের প্রথম সবাক চিত্র "আলম আরা" ১৯৩১ সালের ১৪ মার্চ বোম্বের ম্যাজিস্টিক সিনেমা হলে মুক্তি লাভ করে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ছবিটি প্রযোজনা করেন আরবদেশীয় ব্যবসায়ী আরদোশর ইরানী। কলকাতার ম্যাডান থিয়েটার্স, বোম্বের কৃষ্ণ ফিল্ম কোম্পানি ও ইমপেরিয়াল মুভি টোন সর্বপ্রথম ভারত তথা উপমহাদেশে সবাক কাহিনী চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম সবাক কাহিনী চিত্র নির্মাণে সক্ষম হন ইমপেরিয়াল মুভি টোন। চলচ্চিত্রের ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, 'আলম আরা'র মুক্তির ঠিক এক মাস আগে ১৯৩১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সবাক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ রেখেছিলেন কলকাতার এই জে এফ ম্যাডান কোম্পানি। সেইসময়ের প্রখ্যাত মুন্নি বাঈয়ের একটি গান শুটিং করে সবাক চিত্রের মাধ্যমে উপহার দিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটি। এই সঙ্গীত চিত্রটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয় তৎকালীন কলকাতার ক্রাউন হলে। শুধু তাই নয় আলম আরার মুক্তির তারিখেই (১৪ মার্চ ১৯৩১ সাল) ম্যাডান কোম্পানি আরো একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য পাঁচমিশালী সবাক ছবি উপহার দেন ওই ক্রাউন হলেই। এরপর ১৯৩১ সালের ১১ এপ্রিল জেএফ ম্যাডান কোম্পানির তৈরি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা সবাক চিত্র 'জামাই ষষ্ঠী' ক্রাউন সিনেমা হলে মুক্তিলাভ করে। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বাংলা সবাক কাহিনী চিত্র। ছবিটির পরিচালনায় ছিলেন অমর চৌধুরী। ঠিক এই বছরই নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই নব প্রতিষ্ঠানের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র "দেনা পাওনা" ১৯৩১ সালের ২৪ ডিসেম্বর চিত্রায় মুক্তি পায়। এবছরেই আরো কয়েকমাসের মধ্যে ম্যাডান কোম্পানি আরো ৩টি পূর্ণাঙ্গ সবাক চিত্র 'জোরবরাত', 'ঋষির প্রেম', 'প্রহ্লাদ' ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের কৌতুক চিত্র 'তৃতীয় পক্ষ' তৈরি করে সবাক ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এমনিভাবেই ভারতীয় সবাক ছবির সূচনা হয়েছিল ম্যাডান কোম্পানি সৌজন্যে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ম্যাডানের তোলা ছবির সংখ্যা ছিল ৬১ (বাংলা ১০ ও হিন্দি ৫১)।

৪.১.৬ অন্যান্য স্টুডিও

স্টুডিও নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের তৎকালীন পরম্পরায় ম্যাডান কোম্পানি বা ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি ছাড়া অন্য যে নাম করা স্টুডিওগুলো ছিল সেগুলি হল

- অরোরা সিনেমা কোম্পানি — যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১১ সালে।প্রতিষ্ঠতা ছিলেন অনাদিনাথ বসু ও দেবী ঘোষ। এদের তৈরি প্রথম ছবি 'রত্নাকর'। ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক ছিলেন সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন চুনিলাল দেব, শশীমুখী ও সুশীলাবালা। এটি ৭রিলের ছবি ছিল।
- ইন্ডিয়া ফিল্মসকোম্পানি ছবি নির্মাণ করা ছাড়াও ছবি পরিবেশনার কাজ করতেন।

- কোহিনূর ফিল্ম কোম্পানি যাদের প্রথম ছবি 'কৃষ্ণ সুদামা' (৭রিলের ছবি)
- ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানি এবং এদের প্রথম ছবি 'লব কুশ'।
- হিন্দুস্তান ফিল্ম কোম্পানি - এদের প্রথম ছবি 'কংস বধ'৭ রিলের এই ছবি মুক্তি পায় ১৯২২ সালে।
- তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি - প্রথম ছবি 'আঁধারে আলো' মুক্তি পায় ১৯২২ সালে।
- ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেড নামক এই স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ। ১৯২৯ সালে ৭ জানুয়ারি স্টুডিও শুরু হয়। ধীরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে এসে এই কোম্পানি শুরু করেন। মোট আটটি ছবি তৈরি হয় এখানে। 'কামনার আগুন' (১২ রীলের), 'টাকায় কি না হয়' (৪ রীলের), 'দুষ্টু বালক' (৩ রীলের), 'অলীক বাবু' (৭ রীল), 'মরণের পরে' (১০ রীলের), 'সীমান্ত চোর' (১০ রীল) এবং 'চরিত্রহীন' (১০ রীল)।

ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেড বাংলা চলচ্চিত্র কে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথমত বিশেষ কিছু প্রতিভা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের হাতে খড়ি এখানে। যেমন দেবকী কুমার বসু এখানে কাজ শুরু করেন। দ্বিতীয়ত ঘরের মেয়েদের ধীরেন্দ্রনাথ এখানেও নিজের ছবির জন্য নিয়ে আসেন। এখানেই 'টাকায় কি না হয়' ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। তবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো বাংলা সিনেমার নির্বাক যুগের একটি মাত্র খন্ডচিত্র পাওয়া যায়, তার নাম 'জামাইবাবু'। পরিচালক ছিলেন কালীপদ দাস। এটি ১৯৩১ সালে নির্মিত হয়। স্ল্যাপ-স্টিক ধরনের কমেডি ছবি ছিল 'জামাইবাবু'।

দক্ষিণ ভারতেও চলচ্চিত্রের ও স্টুডিও সিস্টেমের বিকাশ হয়েছে সমান তালে। আর নটরাজা মুদালিয়ার নামে এক ব্যবসায়ী নিজের আগ্রহে সিনেমাটোগ্রাফি শিখে নিজের ইন্ডিয়ান ফিল্ম কোম্পানি বানান ও বেশ কিছু ছবি তৈরি করেন যা ছিল মূলত পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর। ১৯২৩ সালের মধ্যে ছটি নির্বাক ছবি তৈরি করেন। প্রথম প্রয়াস ছিল 'কিচকা বধ' (১৯১৭), তারপর তৈরি হয়েছে দ্রাউপাদি, লব কুশ, মার্কণ্ডেয়, মায়ি রাবণ। এইসব ছবিতে ইংরাজি ও স্থানীয় ভাষায় সাবটাইটেল থাকত।

৪.১.৭ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে একটি বিশেষ সময়কে প্রমথেশ যুগ বলা হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রমথেশ বড়ুয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম।প্রমথেশ বড়ুয়ার জন্ম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ২৪ অক্টোবর গৌরীপুর রাজপরিবারে। বাবা ছিলেন শ্রী প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া। প্রমথেশ পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশোনা খেলাধুলা গান-বাজনা এবং ছবি আঁকার আগ্রহ ছিলো। পরবর্তীকালে এসবের সঙ্গে যুক্ত হয় তার ছবি তোলার শখ এবং ছবি তোলার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ এতটাই গভীর ছিল যে এই বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে তিনি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় যান। প্রমথেশ ১৯২০ সালে কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন এবং ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সি থেকে পদার্থবিদ্যা নিয়ে বিএসসি পাস করেন। ১৯২৮ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টিতে যোগ দেন। এছাড়া অসমের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য ছিলেন ১৯২৮ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। এর মাঝে বিদেশে থাকাকালীন আর্নেস্ট এর ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সিনেমা শিল্পে ১৯২৯ সালে ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সাথে একযোগে তিনি তৈরি করেন ব্রিটিশ লিমিটেড। প্রমথেশ চন্দ্র কোম্পানির এক অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। এর আগে তিনি তাঁর সমসাময়িক চলচ্চিত্রকারদের তিনি কাজ করতে শিখে এ জগতে আসেন নি। পরে তিনি প্যারিসের বিখ্যাত

ফক্স ফিল্মস এর ক্যামেরাম্যান মিস্টার বর্জাজের অধীনে সহ ক্যামেরাম্যান হিসাবে কাজ করে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টসের নির্বাক চলচ্চিত্র 'ভাগ্যলক্ষী' -তে অভিনয় করে তিনি চলচ্চিত্র জগতের বিদগ্ধজনের নজরে আসেন। ১৯৩১ সালে প্রমথেশ বড়ুয়া বরুয়া ফিলমস নামে একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বড়ুয়া ফিল্মস এর প্রথম ছবি ছিল 'অপরাধী' যেখানে প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালনা ছাড়াও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং দর্শকের মনে দাগ কাটেন। এই ছবির দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছিল ফ্লোরে, কৃত্রিম আলোতে। প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ছিল 'বাংলা ১৯৮৩'।

১৯৩২ সালে প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। এবং ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ এর এই স্বর্ণযুগের মধ্যে তৈরি করেন একের পর এক কালজয়ী ছবি এবং সূচনা করেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক নতুন যুগের। বিখ্যাত ছবিগুলো ছিল 'দেবদাস', 'রজত জয়ন্তী', 'গৃহদাহ', 'অধিকার', 'মুক্তি', 'জিন্দেগি', 'উত্তরায়ণ', 'মায়ের প্রাণ', 'শেষ উত্তর', 'চাঁদের কলঙ্ক', 'মায়া'। তবে 'মুক্তি' এবং 'দেবদাস' এই দুটি ছবি বাংলা তথা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের বারেবারে ভাবিয়েছে এবং আলোচনায় উঠে এসেছে। তার নিজস্ব অভিনয়শৈলী বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। 'মুক্তি' এবং 'রজতজয়ন্তী' -তে বাস্তবতার ছাপ ছিল। তাত্ত্বিকদের মতে সেই বাস্তবতার বোধই আরো দৃঢ় ভাবে ভারতীয় ছবিতে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। চলচ্চিত্র নির্মাণে ক্যামেরার অবাধ গতি আর প্রকৃতিকে স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব দেখা যায়। বিষাদমাখা প্রেমের গল্প, তার সাথে আভিজাত্যপূর্ণ, নিরাসক্ত ভাবাপন্ন অভিনয় ওনার ছবিগুলিতে অনন্য মেলোড্রামা সৃষ্টি করেছিল।

নিউ থিয়েটার্স সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর প্রমথেশ চন্দ্র বিভিন্ন স্টুডিওতে কাজ করেন। মোট ২১ টি ছবি পরিচালনা করেন প্রমথেশ বড়ুয়া। এই ছবির মধ্যে ১৪টি ছিল বাংলা ছবি আর ৭টি হিন্দি। তিনি কয়েকটি ছবিতে সুরারোপও করেছেন ১৯৫১ সালে ২৯ নভেম্বর এই মহান শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে।

৪.১.৮ স্টুডিও সিস্টেম

ভারতীয় সিনেমায় স্টুডিও সিস্টেমের স্বর্ণযুগ ছিল ১৯৩০ থেকে ৪০ এর দশক। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে স্টুডিও নির্ভর হয়ে ওঠে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস। এই তিরিশের দশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো সিনেমার সবাক হওয়া।

৪.১.৮.১ সবাক সিনেমা

ভারতবর্ষে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ইরানির 'আলম আরা' ছবিতে প্রায় এক ডজন গান এবং নাচ ছিল। ছবিটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বলা হয় এই ছবিতেই কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতীয় সিনেমার ধারা সৃষ্টি হয়। ১৯৩৩-৩৪ সাল, ভারতীয় সিনেমার মূল উপাদান ছিল গান আর নাচ। এমনকি কোনো কোনো ছবিতে প্রায় ৫০ খানা গানও থাকত। তবুও ভারতীয় দর্শক বিদেশি ছবির থেকে এই নৃত্য গীত সম্বলিত ছবিই বেশি উপভোগ করতেন। বাংলা সিনেমা সবাক হয়েছিল বিখ্যাত গায়িকা মুন্নি বাই -এর গান গাওয়ার দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। এটিও ম্যাডানরাই তুলেছিলেন। এমনকি বাংলার প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'জামাইষষ্ঠী' নির্মাণের কৃতিত্ব ম্যাডানদের। ১৯৩১ সালের ১২ই এপ্রিল জামাইষষ্ঠী মুক্তি লাভ করে। বিদেশি ছবির আসার ফলে যে দর্শক মণ্ডলী ভারতীয় সিনেমার প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন, এই সবাক সিনেমা তাদের আবার ফিরিয়ে আনে। সিনেমা জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম হিসাবে এই

প্রথম সাফল্যের মুখ দেখে। ১৯২৮ সালে এদেশে মোট ২৫৭টি সিনেমা হল ছিল, ১৯৩৮ সালে তা বেড়ে হয় ১৬৫৭। শহরে, মফস্বলে এমনকি বর্ধিষ্ণু গ্রাম অঞ্চলেও স্থায়ী সিনেমাহল তৈরি হয়। আর গ্রামে গ্রামে তৈরি হয় অস্থায়ী সিনেমা হল।

সিনেমা শিল্পের এই বানিজ্যিক সম্প্রসারণের পাশাপাশি সিনেমা নির্মাণ শৈলীতেও এক পরিবর্তন আসে। সিনেমার মান উন্নত হয়। মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় অবদান ছিল স্টুডিও সিস্টেমের। ত্রিশের দশকের প্রথমদিকে বোম্বাই, পুনে আর কলকাতায় এবং দশকের শেষের দিকে মাদ্রাজ সহ দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি শহরে স্থায়ী বিনিয়োগের ভিত্তিতে স্টুডিও তৈরি হয়। বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্টুডিও হল নিউ থিয়েটার্স। সবাক যুগে কিছু সবাক চলচ্চিত্র যেমন 'জোর বরাত' (১৯৩১), 'ঋষির প্রেম'(১৯৩১),'তৃতীয় পক্ষ'(১৯৩১), ইত্যাদি তৈরি করলেও ১৯৩৩ সালে ম্যাডান কম্পানি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে নিউ থিয়েটার্স এর অবদান বাংলা সিনেমার এক উল্লেখযোগ্য স্বর্ণালী অধ্যায়।

৪.১.৮.২ নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্স এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। ১৯৩০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োর উদ্বোধন হয়। টালিগঞ্জের শুরু হয় এক নম্বর স্টুডিও, যার দুই নাম্বার শাখা স্টুডিও গড়ে ওঠে আনোয়ার শাহ রোডে। ব্যক্তিগত স্টুডিও সিস্টেমের বদলে এখানে একসাথে অনেক গুণী মানুষের সমাবেশ ঘটে। ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর মতো অভিনেতা-পরিচালক, পরিচালক দেবকুমার বসু, পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ একত্রিত হয়ে একসাথে কাজ করতে আসেন।

নিউ থিয়েটার্স প্রযুক্তিগত অনেক পরিবর্তন আনে যা ভারতীয় সিনেমা এর আগে দেখেনি। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন ইন্ডোর শুটিং শুরু হয়। তৈরি করা হয় ফ্লোর অর্থাৎ শুটিংয়ের চত্বর। তাঁর সাথে ব্যবস্থা করা হয় কৃত্রিম আলোর। ক্যামেরা পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ যেমন, ট্র্যাকিংএর ব্যবহার প্রথম এখানেই দেখা যায়। এখানে পরিচালন ব্যবস্থা এবং পরিচালকের ভাবনার স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। লোকচালনা এবং মানব সম্পদ বিকাশকে বিশেষ করে প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্টুডিওর সাথে জড়িত সমস্ত কলাকুশলী, শিল্পী মাস মাইনের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হতেন। স্টুডিওর কর্মচারী ও শিল্পীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম ছিল, যার দ্বারা কলাকুশলীদের শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি হবে এবং তাদের শৃংখলাবদ্ধ রাখা যাবে ভাবা হত। যেমন, কলাকুশলী এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের কোনো ছবির কাজ না থাকলেও নিয়মিত স্টুডিওতে হাজির থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। বাধ্যতামূলক ছিল নিয়মিত অনুশীলন।এই নিয়মিত অনুশীলন এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা তারা নিজেদের আরো উন্নত করার সুযোগ পেত। এই কারণেই স্টুডিওতে তৈরি ছবিগুলোর মধ্যে দক্ষ কুশলতার একটা নূন্যতম মাত্রা দেখা যেত এবং তাতে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়েছে চলচ্চিত্র মাধ্যম। ফলে এই স্টুডিওগুলি বিশের দশকের স্টুডিও গুলির মত শুধু শুটিংয়ের জায়গা ছিল না, বরং বৃহত্তর অর্থে চলচ্চিত্র শিক্ষারক্ষেত্রও ছিল। নিউ থিয়েটার্স এর ছবি 'ভাগ্যচক্র' থেকে প্লেব্যাক গানের ব্যবহার শুরু হয়। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যবহারে ছবি যে নতুন চেহারা নেয়, নিউ থিয়েটার এর ছবি বিদ্যাপতিতে প্রথম দেখান পরিচালক দেবকী বসু।

এত বড় কর্মকাণ্ডের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা অত্যন্ত বিত্তশালী এবং উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে। বাবা ছিলেন বিশিষ্ট আইনবিদ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। নৃপেন্দ্রনাথ ছিলেন তৎকালীন বড়লাটের আইন

উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। বীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৯০১ সালের ৫ই জুলাই ভাগলপুরে। প্রেসিডেন্সি থেকে আইএসসি পাস করে ১৯২৩ লন্ডন থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। কলকাতা এসে মার্টিনবার্ন কোম্পানিতে শিক্ষানবিশ থেকে,পরে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু তাতে মন ভরেনি তাঁর এবং অবশেষে ১৯২৮-২৯ সালে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত হন চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের তাগিদে। ১৯৩০ সালে এই বিশাল কর্মকান্ডের অবতারণা করেন।

ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই নিউ থিয়েটার্স এবং অন্যান্য স্টুডিও গুলির মধ্যে পুঁজি পরিকল্পনায় যথেষ্ট অদক্ষতা ছিল। তাদের কাজের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অভাব ছিল। এক ধারে ছবি তৈরীর নির্দিষ্ট সময়সীমা লঙ্ঘিত হতো, অন্যদিকে পুঁজি আবর্তনের কোনো সদর্থক রীতি বা পরিকল্পনা ছিল না। সাহায্যকারী আর্থিক সংগঠনগুলি মূলত বিদেশীদের কুক্ষিগত হওয়ার দরুন ভারতীয় সিনেমা সম্পর্কে বা সেখানে লগ্নি করার বিষয়ে তারা উদাসীন ছিল। বীরেন্দ্রনাথ সরকারও বানিজ্যের মূলমন্ত্র পুঁজি-পন্য-আরও পুঁজি, বানিজ্যের এই চক্রাকার আবর্তনকে নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলেননি।

আসলে সিনেমার সাফল্যের তখন মূল কারণ ছিল দর্শক আনুকূল্য। আর তার মূলে ছিল তৎকালীন সিনেমার শৈলী। একাধারে সিনেমা সবাক হয়েছে অন্যদিকে সিনেমা সাহিত্য নির্ভর হয়ে ওঠে। শব্দ সংযোজনার সুযোগ নিয়ে তৎকালীন বাংলা সিনেমা সম্পূর্ণ ভাবে সাহিত্যের চিত্ররূপ দিতে শুরু করে। নাচ গান এবং সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্ররূপ সিনেমাকে দর্শকমহলে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এনে দেয়। কিন্তু চল্লিশের দশকের পর থেকেই সমস্ত স্টুডিও সিস্টেম ভেঙে পড়তে শুরু করে। এর মূলে ছিল শৃঙ্খলাহীন পুঁজি ব্যবস্থা। পুঁজির বাজার তৈরি না হওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে মহাজনী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হওয়ার দরুন ঋণগ্রস্ত স্টুডিও মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও হারাতে হয়। এছাড়াও ব্যবসার উন্নতির সাথে সাথে পড়ন্ত জমিদার এবং উড়ন্ত কালোয়াররা ভীড় করে লগ্নি করে সহজেই একতরফা মুনাফা করত। স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগের এককেন্দ্রিকতা বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। স্টুডিও মালিক এবং প্রযোজক দুটি আলাদা গোষ্ঠী সূত্র তৈরি হয়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রিব্রত্ন হয় যখন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আর নিছক বেতনভুক হয়ে থাকতে রাজি হয় না। তারা তাদের ব্যবসায়িক মূল্য এবং তারকা ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। নিউ থিয়েটার্স তাই এত প্রতিকূলতার মধ্যে ক্রমশ বিলীন হয়ে হতে শুরু করে। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত গড়ে দুই বা তিন খানি ছবি বানালেও অবস্থার অবনতি ঘটে। স্টুডিও সিস্টেম এইভাবেই ক্রমে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

৪.১.৯ সারাংশ

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করলাম সেই গুলি হলো:

- ভারতীয় সিনেমার যাত্রাপথ
- দাদাসাহেব ফালকে
- ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)
- কাহিনীনির্ভর চলচ্চিত্র এবং ম্যাডান
- অন্যান্য স্টুডিও

- প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া
- স্টুডিও সিস্টেম

৪.১.১০ অনুশীলনী

১. ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দাদাসাহেব ফালকে অবদান বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. বাংলা চলচ্চিত্র ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির আধুনিক ভাবনায় কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা আলোচনা করুন।

৩. বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ম্যাডান এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪. ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রমথেশ বড়ুয়া অবদান ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভারতীয় সিনেমার সবার সাথে স্টুডিও সিস্টেমের যোগাযোগ কোথায় - ব্যাখ্যা করুন।

৪.১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

- সোনার দাগ গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ।
- বাংলা সিনেমা অরুণ দাশগুপ্ত।
- বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস মুখোপাধ্যায়।
- History - Bengali cinema Kiranmoy Raha*f*
- Encyclopaedia of Indian cinema*f*
- Mass Communication in India– Keval J kumar
- গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি, ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
- চলচ্চিত্রের অভিধান—ধীমান দাশগুপ্ত
- আধুনিক গণমাধ্যম — ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

মডিউল-৪ : ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস

একক ২ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের গুণীজন (স্বাধীনতা পরবর্তী)

৪.২.০ গঠন

৪.২.১ উদ্দেশ্য

৪.২.২ সত্যজিৎ রায়

৪.২.৩ ঋত্বিক ঘটক

৪.২.৪ মৃণাল সেন

৪.২.৫ তপন সিংহ

৪.২.৬ রাজ কাপুর

৪.২.৭ গুরু দত্ত

৪.২.৮ হৃষিকেশ মুখার্জী

৪.২.৯ সারাংশ

৪.২.১০ অনুশীলনী

৪.২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪.২.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যাদের বিষয়ে আলোচনা করবো তারা হলেন:

- সত্যজিৎ রায়
- ঋত্বিক ঘটক
- মৃণাল সেন
- তপন সিংহ
- রাজ কাপুর
- গুরু দত্ত
- হৃষিকেশ মুখার্জী

৪.২.২ সত্যজিৎ রায়

কেবল মাত্র ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্বের বরেণ্য চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন সত্যজিৎ রায়। ভারতীয় সিনেমাকে তিনিই বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করেছেন। তার বহু ছবি প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। সমগ্র এশিয়ায় কুরোশাওয়াকে বাদ দিলে এত বড় মাপের বহুগুণ সম্পন্ন চলচ্চিত্রকার আর হয়নি বলেই ধরা হয়। আদ্যপান্ত একজন শিল্পী সত্যজিতের বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ শুধু সিনেমায় নয়, ঘটেছে সাহিত্যে, আঁকায়, প্রচ্ছদ নির্মাণে এবং ক্যালিগ্রাফিতে। চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গেই তিনি গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। চিত্রনির্মাণকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তিনি। চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত রচনা ও নির্দেশনা, ক্যামেরা, শিল্পনির্দেশনা, অভিনয় প্রতিটি বিষয়কেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ২ মে , ১৯২১ কলকাতায় এক ঐতিহ্যশালী পরিবারে। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও পিতা সুকুমার রায়ের উত্তরসূরি সত্যজিৎ রায় পড়াশুনা করেন কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে। ইস্কুলের পাঠ নেন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স গ্রাজুয়েট। ছাত্রাবস্থা থেকেই ফোটোগ্রাফী, পাশ্চাত্ত সংগীত এবং সিনেমার প্রতি ভালবাসা তৈরি হয়। তাঁর ছবি আঁকার হাত ছিল খুবই ভালো। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকার সময়েই শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যান ছবি আঁকা শিখতে। তখন কলাভবনের দায়িত্বে ছিলেন নন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতনের পাঠ শেষে কলকাতায় ফিরে এসে যোগ দেন একটি বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থায়। এই বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করতে করতেই প্রথম সিনেমা তৈরির কথা মাথায় আসে তাঁর। সেই সময় কাজের ফাঁকে দেখতে থাকেন অজস্র বিখ্যাত ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিদেশী ছবি। ডি সিকার 'বাই সাইকেল থিভস' দেখে অনুপ্রাণিত হন নয়াবাস্তববাদী ঘরানায় ছবি করার জন্য। এর মাঝে বন্ধু হরিসাধন দাশগুপ্তর জন্য রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরের চিত্রনাট্য লেখেন। ইতিমধ্যে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে। তার আগেই জা পল রেনোয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে এবং তাঁর নির্মীয়মাণ ছবি 'রিভারে'র পর্যবেক্ষক হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সত্যজিৎ নিজের প্রথম ছবির জন্য বেছে নেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। সামান্য কিছু অংশ শুটিঙের পর টাকার অভাবে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে স্ত্রীর এগিয়ে আসা অর্থসাহায্য ও পশ্চিমবঙ্গের

তৎকলীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় 'পথের পাঁচালী' ছবি শেষ করেন। কোন বড় তারকা ছাড়া একেবারে প্রায় নবাগত কলাকুশলীদের নিয়ে শেষ করেন 'পথের পাঁচালী'। ১৯৫৫ সালে সেই ছবি মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে যায় গোটা দেশের চলচ্চিত্রপ্রেমিদের মধ্যে। শিল্পরসিক মহলও একেবারে অন্যধারার ছবি 'পথের পাঁচালীর' কালজয়ী গুরুত্ব অনুধাবন করেন। সংবাদপত্রের সমালোচনায় উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয়। পরের বছর ১৯৫৬ সালে 'পথের পাঁচালী' যায় কান চলচ্চিত্র উৎসবে। সেখানে শ্রেষ্ঠ মানবতার দলিলের পুরস্কার জিতে নেয়। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হয় ছবিটি। ১৯৫৭ সালে তৈরি করেন পরের অধ্যায় নিয়ে 'অপরাজিত'। এই ছবিটিও বিদেশে পুরস্কৃত হয়। অসামান্য এই ছবিটি সত্যজিৎ রায়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

'পথের পাঁচালী' ছিল অপুর বাল্যকাহিনী। বালক অপুর পথ চলার আখ্যান। গ্রামীণ পটভূমিতে ছোট্ট অপুর মানসলোকের বিস্ময়, আবেশ, বড় হয়ে ওঠার সাংসারিক অনটন ও জীবন কৌতুহল চিত্রিত। 'অপরাজিত' ছিল কিশোর অপুর বড় হয়ে ওঠার কাহিনী। শৈশবের ভিটের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে অপু এগিয়ে যায় শহরের দিকে। এইখানেই বড় হয়ে ওঠে তার অপরাজিত সত্ত্বা। অসম্ভব সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যে ছবির অন্তরর্নিহিত মেজাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায়। শুটিঙের জন্য বারাণসী, গ্রামের ভিটে, কলকাতা এই তিনটি জায়গারই দৃশ্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গে অপুর জীবনের যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তা অত্যন্ত অর্থবহ ও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্যদিকে 'অপুর সংসার' যুবক অপুর জীবনকাব্য। তার ভালবাসা ও যন্ত্রণার মিশ্রণে একাকার বেদনা বিধুর জীবনকাহিনী। অপুর চাকরি খোঁজা, রোমান্টিকতা, অপর্ণার মৃত্যু, অপুর নিরুদ্দেশে যাওয়া এবং তারপর আবার ছেলে কাজলের কাছে ফিরে এসে তাকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে পথ চলা এবং অস্বীকার করতে চাওয়া শিকড়ের কাছে ফিরে আসা। ছবিটি দেশে বিদেশে উচ্চ প্রশংসা পায়। আজও সিনেমাপ্রেমীর মনের মধ্যে বেঁচে আছে অপুর সংসার। অসামান্য ফোটোগ্রাফী, মিউজিক ও অভিনয়ের দলিল এই চলচ্চিত্র।

'পরশপাথর' (১৯৫৭) সত্যজিৎ রায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। এক অপূর্ব ফ্যানটাসি তৈরি করেছেন এই ছবিতে। একজন অত্যন্ত নিম্নবিত্ত মানুষ হঠাৎ বড়লোক হলে কী হতে পারে তারই সার্থক চিত্রায়ন হয়েছে পরশ পাথরে। নিখুঁত চিত্রনাট্য, উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রয়োগ ও ক্যামেরার দৃষ্টিকোণের সঠিক ব্যবহার ছবিটির শিল্পগুণ বৃদ্ধি করেছে। আবার 'দেবী' (১৯৬০) ছবিতে সত্যজিৎ রায় আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে একই সাথে উপস্থাপিত করেছেন যেখানে একজন মানুষ তার নিজের পুত্রবধূর মধ্যে দেবীত্ব আরোপ করে দেবীপূজায় মেতে উঠেছেন। সংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সংঘাত খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক এই ছবিতে। এরপর রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকীতে তৈরি করলেন 'তিনকন্যা' (১৯৬১)। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি। তিনটি গল্পে রয়েছে তিনটি কন্যার কাহিনী। প্রথম গল্প মণিহারা, দ্বিতীয় গল্প পোষ্টমাস্টার এবং শেষ গল্প সমাপ্তি। তিনটি গল্প তিনটি মেজাজের। মণিহারায় নারীর একাকিত্ব ও অলংকার প্রতি, পোষ্টমাস্টারে একজন শহুরে শিক্ষিত মানুষের গ্রামীণ পটভূমিকায় একটি মেয়ের সঙ্গে গভীর মানবিক সম্পর্কের টানাপড়েন আর সমাপ্তিতে বর্হিমুখী চপল কিশোরীর ধীরে ধীরে একজন মেয়ে হয়ে ওঠার গল্প অসাধারণ চিত্রভাষায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎরায়।

১৯৬২ তে করলেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। দার্জিলিংএর প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড়ভাবে প্রভাবিত হয় তাই এই ছবির মুখ্য বিষয়। ১৯৬৩ তে তৈরি করেন 'মহানগর'। নরেন্দ্র মিত্রের নাগরিক কাহিনী নিয়ে এই ছবিতে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক বন্ধুর নীতিবোধ ও সংগ্রামের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে। এরপর ১৯৬৪ তে নির্মিত হয় ''চারুলতা', রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় গল্প অবলম্বনে। এটি সত্যজিৎ রায়ের এক বিরল কুশলী সৃষ্টি। পুরোপুরি রাবীন্দ্রিক যুগের প্রেক্ষাপটে নারী পুরুষের এবং সমস্ত মানবিক সম্পর্কের জটিলতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন সিনেমার ভাষায়, প্রতীকি ব্যঞ্জনায় ও চিত্রকল্পে। ১৯৬৬ সালে করেন নায়ক। চিত্রতারকা উত্তমকুমারকে নাম ভূমিকায় রেখে একজন সিনেমার হিরোর ব্যক্তিজীবনের অভিঘাত, সংশয়, হতাশা, বেদনাকে দক্ষতার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন। সামাজিক গভীর বিষয়ের বাইরেও তাঁর ছবির ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে ছোটদের

জগতেও। ১৯৬৮ তে দাদু উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে ছোটদের জন্য অসামান্য এক ছবি গুপী গাইন বাঘা বাইন তৈরি করলেন। আবহসংগীত ও সঙ্গীত এই ছবির এক বিরাট সম্পদ।

১৯৬৯ সালে তৈরি করলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে অরণ্যের দিনরাত্রি। ১৯৭০ সালে তৈরি হল প্রতিদ্বন্দ্বী। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তোলা এই ছবিতে সত্তরের দশকের অস্থিরতা, সংকট ফুটে উঠেছে। ১৯৭৩এ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে তৈরি হয় দুর্ভিক্ষের ছবি 'অশনিসংকেত'। দুর্ভিক্ষের বাস্তবতা, অসময়ের সংকট, মানুষের অসহায়তা, প্রেম, ভালবাসা ও প্রকৃতি উঠে এসেছে অত্যন্ত সুনিবিড় ভাবে। এরপর ১৯৭৪ এ নির্মিত হয় 'সোনার কেল্লা', ১৯৭৫ এ 'জনঅরণ্য' হয়ে ওঠে এক বিশেষ সময়ের দলিল। বহু ছবির মধ্যে এরপর তার উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' (১৯৭৮), 'হীরকরাজার দেশে' (১৯৮০), 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৪), 'জয়বাবা ফেলুনাথ', 'গণশত্রু' (১৯৮৯), 'শাখাপ্রশাখা' (১৯৯০) ও 'আগন্তুক' (১৯৯১)। তাঁর প্রতিটি ছবিতেই নিজস্ব শৈলীর ছাপ রয়েছে। বিশেষ করে শেষ ছবি 'আগন্তুকে' তার জীবনদর্শন বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে, আগন্তুকরূপী উৎপল দত্তের আচরণে ও সংলাপে।

সত্যজিৎ রায় কয়েকটি বেশ তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেছেন। তাঁর প্রথম সার্থক তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ'। এই স্বল্প দৈর্ঘের তথ্যচিত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনকে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতন বহুমুখী প্রতিভার দীর্ঘ জীবনকে স্বল্পপরিসরে ব্যক্ত করা খুবই কঠিন। কিন্তু সত্যজিৎ রায় এই অসাধ্যসাধন করেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে অনায়াস দক্ষতায়। তার অন্য কয়েকটি তথ্যচিত্রের মধ্যে রয়েছে 'ইনার আই', 'বালা', 'সিকিম' এবং 'সুকুমার রায়'। এছাড়াও চলচ্চিত্র বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন। 'বিষয় চলচ্চিত্র' এবং 'আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস' খুবই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সত্যজিৎ রায় ভারতীয় সিনেমাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তার তুলনা নেই। শ্যাম বেনেগাল তার জীবন নিয়ে তথ্য চিত্র তৈরি করেছেন। অস্কার সম্মানে ভূষিত, বিশ্ববরেণ্য এই চলচ্চিত্রকার ভারতের গর্ব।

৪.২.৩ ঋত্বিক ঘটক

ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক দুর্দম খামখেয়ালি 'দামাল শিশু' হলেন ঋত্বিক ঘটক। সমস্ত হিসেবের বাইরে উজ্জ্বল সৃজনশীলতার চমকে, মানবিক আবেদনের দীপ্তিতে, কথায়, ছবিতে, সংগীতে তৈরি করেছেন চলচ্চিত্রের গদ্য পদ্য ও প্রবন্ধ। 'নাগরিক' থেকে 'যুক্তি তর্ক গল্পে' যে উত্থান এবং বিন্যাস ঘটেছে তার মধ্যে কখনো মূর্ত হয়েছে কবিতা, কখনও গদ্য আবার কখনও দার্শনিক উপলব্ধি। প্রত্যেকটি ছবিতেই ফুটে উঠেছে স্বাতন্ত্র, সামাজিক সচেতনতা এবং নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার সযত্ন প্রয়াস। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তিনি এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন যাকে সহজেই ঋত্বিক ঘরানা বলে চিহ্নিত করা যায় এবং তাঁর প্রভাব আজও বহমান।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

ঋত্বিক ঘটকও ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ সাহিত্য, নাট্য আন্দোলন ও অভিনয়, চলচ্চিত্র পরিচালনা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে ছিল তার অবাধ বিচরণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি তার প্রতিভার নিজস্ব মৌলিকতার ছাপ রেখে গেছেন। প্রতিটি শিল্প ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় সৃজনশীল। বলা যেতে পারে এক বিশেষ বৌদ্ধিক চেতনা সতত প্রভাবিত করেছে তার শিল্পকর্মকে। তার প্রাথমিক শিল্পী সত্তার প্রথম প্রকাশ ঘটে কবি হিসেবে। অল্পদিনের মধ্যেই কবিতা ছেড়ে কথাসাহিত্য, তারপরে নাটক এবং অভিনয় এবং সবশেষে চলচ্চিত্র পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হন। সব সময়ই লক্ষ্য ছিল কি করে মানুষের একদম কাছে পৌছনো যায়, একটা মাধ্যম থেকে আর একটা মাধ্যমে হাত দিয়েছেন কেবলমাত্র এই একই পোঁছে দেওয়ার তাগিদে। কোন একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন মানুষের কাছেই নিজের বক্তব্যকে আরও ভালভাবে পৌঁছে দেবার জন্যই তিনি সাহিত্য থেকে নাটকে এসেছেন। তারপর একদিন নাটক থেকে সিনেমায় এলেন। এরপর বলেছেন যদি এমন কোন মাধ্যম আবিস্কার হয় যা তাকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাবে তাহলে সেদিন ছুঁড়ে ফেলে দেবেন সিনেমাকে এবং স্বাগত জানাবেন ঐ নতুন মাধ্যমকে। সিনেমা তার কাছে মানুষের কথা বলে মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটি শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম ছাড়া কিছু নয়।

প্রথম ছবি 'নাগরিকে'র কাজ শুরু হয় ১৯৫০ - ৫১ সালে। বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে অতি সামান্য অর্থে তৈরি করেন এই ছবি। কিন্তু ছবিটি সেই সময় মুক্তিলাভ করেনি। ছবির বিষয়বস্তু হল এক টুকরো নিশ্চিন্ত জীবনের সন্ধানে এক যুবক নাগরিকের জীবন পরিক্রমার গল্প। যুবকটি স্বপ্ন দেখে সে চাকরি পাবে। সুখী করবে প্রিয়জনদের। চাকরির ইনটারভিউ দেয়, কিন্তু চাকরি হয় না। আবার ইনটারভিউ দেয় কিন্তু এবারেও চাকরি হল না। হতাশা আসে আর সেখান থেকেই এক বৃহত্তর উপলব্ধি আসে যে তৎকালীন সামাজিক কাঠামোয় এই হতাশা শেষ হবার নয়। এমনি অসহায় দুটি ছেলে মেয়ে এরপরও একসঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচতে চায়। দেশভাগের পর সেই সময়ের ক্ষয়িষ্ণু নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক এই ছবিতে। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭৭ সালে।

পরের ছবি 'অযান্ত্রিক'। মুক্তি পায় ১৯৫৭ সালে, যা ছিল দর্শকদের সঙ্গে তার প্রথম সরাসরি পরিচয়। এই ছবিটি সাদরে গৃহীত হল এবং শিল্পানুরাগী দর্শকমহলে আলোড়ন ফেলে দিল। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিমায় নিও - রিয়ালিজিমের ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিখ্যাত চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক জর্জ সার্দুল এই ছবিটিকে অসামান্য এক যুগান্তকারী ছবি বলে বর্ণনা করেছিলেন। সুবোধ ঘোষের ছোট গল্প নিয়ে এই ছবিতে একজন ড্রাইভার কীভাবে তার মোটর গাড়িটিকে ভালবাসছে তারই কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতা কী হতে পারে তা সমস্ত দৃশ্য পরিকল্পনায়, আবহ সংগীতে, অভিনয়ের মাধ্যমে এক অপরূপ শিল্পরসের সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তী ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ১৯৫৮ সালে।শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে ছোটদের জন্য একটি চমৎকার উপভোগ্য ছবি। একটি শিশুর চোখ দিয়ে কলকাতা মহানগরকে দেখানোর মধ্যে গভীর জীবনবোধ যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি রয়েছে সংলাপের নাটকীয়তা, দৃশ্যের উপভোগ্যতা এবং স্বাভাবিক অভিনয়ের স্বতঃস্ফূর্ততা।

এরপর তিনি ১৯৫৯ সালে তৈরি করলেন 'মেঘে ঢাকা তারা', যা এযাবৎ কালের একটি যুগান্তকারী ছবি। এখনও সমানভাবে মানুষকে মোহিত করে এই ছবি। নাটকীয়তায়, আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততায়, মানবিক আবেদনে এবং দৃশ্য ও সংগীতের অনির্বচনীয় মেলবন্ধনে এই ছবি ক্লাসিক পর্যায়ের ছবিতে উন্নীত হল। দেশবিভাগের অনিবার্য বাস্তবতা নিয়ে এমন ছবি এর আগে কখনও হয়নি। নিমাই ঘোষের ছিন্নমুলের ডকুমেন্টেশনের উত্তরাধিকার ছিল এই ছবিতে। শুধু ডকুমেন্টেশন নয় এর সঙ্গে ছিল কাহিনীচিত্রের শৈল্পিক নির্মাণ যা দর্শকের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ

ফেলে যায়। এই ছবি থেকেই শুরু হয় এক বিশেষ পর্বের চিত্রনির্মাণ। দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে যে ট্রিলজি তৈরি করেছিলেন ঋত্বিক তার প্রথম ছবি ছিল 'মেঘে ঢাকা তারা'। পরের ছবি দুটি হল যথাক্রমে 'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা'। ১৯৬০এ 'কোমল গান্ধার' তৈরি হয়। ১৯৬১তে নির্মিত হয় 'সুবর্ণরেখা'। 'কোমলগান্ধার'এ একটি নাটকের দলের সদস্যদের দলাদলি, স্বার্থপরতা, অহংবোধ, সংকীর্ণতা এবং একই সঙ্গে পরস্পর নির্ভরশীলতা, মৈত্রী, সহযোগিতা চিত্রিত হয়েছে এই ছবিতে। দেশ বিভাগের সুগভীর বেদনা ও যন্ত্রণাও উঠে এসেছে ছবির অনুষঙ্গ হয়ে। তাঁর ছবিতে নাটকিয়তার বাহুল্য নিয়ে বহু কথা হয়েছে এবং বহু সমালোচকরা এই নাটকীয়তাকে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু জীবনে পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা নাটক খুব অস্বাভাবিক কিছুও নয়। বিশেষত দেশবিভাগের পরবর্তী বছরগুলোতে শিকড় উপড়ানো মানুষগুলোর দুঃখ যন্ত্রণার শেষ ছিল না। সেই সময় বহু উদ্বাস্তু মেয়েরই জায়গা হয়েছিল নিষিদ্ধ পল্লীতে 'সুবর্ণরেখা'র গল্পের মতন। ঋত্বিক মানব জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। স্বপ্ন দেখতেন যথার্থ শিল্পীর মতো। তাই তিনি হতাশার, নিরাশার ছবিতেও তৈরি করেন সেই ইমেজ যা শেষমেশ ভোরের আলোর দিকে চেয়ে থাকতে বলে।

এছাড়াও ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২এর ভেতর ছয়টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন। এগুলি হল ফিয়ার (১৯৬৬), সায়েন্টিস অফ টুমরো (১৯৬৭), ছৌ ডান্স অ পুরুলিয়া (১৯৭১), আমার লেলিন (১৯৭১), দুর্বার গতি পদ্মা (১৯৭১)। তার অসমাপ্ত ছবিগুলি হল কত অজানারে, বগলার বঙ্গদর্শন। এরপর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তুললেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে 'তিতাস একটি নদীর নাম'। রঙের ব্যবহারে, চিত্রগ্রহণের অভিনব কলাকৌশলে উঠে আসে এক ব্যাপ্ত জীবনের ছবি। একসঙ্গে বহু মানুষের এমন বেঁচে থাকার সংগ্রাম বাংলা সিনেমায় এর আগে কখনও চিত্রিত হয়নি। জেলেরা কেমনভাবে বাঁচে, লড়াই করে বাঁচার জন্য , কী সুর ভেসে বেড়ায় মালোপাড়ায় তা সঠিকভাবে ধরেছেন ঋত্বিক এই ছবিতে। অনন্ত এক আশার বোধ ঘুরে ফেরে এক ছবি থেকে আর এক ছবিতে। 'সুবর্ণরেখা' থেকে 'তিতাস' এই আশার আলো দিয়েই শেষ করেছেন তিনি। 'সুবর্ণরেখা'য় সীতার ছেলের হাত ধরে সীতার দাদা পাহাড় ঘেরা শান্ত জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। 'তিতাসে' মৃত্যুপথযাত্রী বাসন্তীর স্বপ্নের দৃশ্যে তিতাসের ধারে শস্য খেতে ঢেউ ওঠে আর তার মধ্যিখান থেকে ছুটে আসে বাঁশি বাজিয়ে একটি ছোট্ট ছেলে। অপরূপ কল্পনায় স্থিরচিত্র, চলচ্চিত্র একাকার হয়ে যায়।তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তর্ক গপ্পো'। প্রধান চরিত্রে ঋত্বিক নিজেই অভিনয় করেছিলেন।

তাঁর সমস্ত সিনেমায় প্রতিফলিত হয়েছে নিজের জীবন, বিশ্বাস, অসহায়তা ও জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা। শিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন মূলত সত্যনিষ্ঠ। এই বিশ্বাসই তাকে ক্লাসিক পর্যায়ের ছবি তৈরি করতে উৎসাহিত করেছে। রূঢ় সত্যকে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন মতো আঙ্গিক বা ফর্মের পরীক্ষা - নিরীক্ষা তিনি করেছেন। প্রতিটি ছবিতেই রয়েছে তার নিজস্ব শিল্পভাবনার ছাপ যা ভীষণ সমকালীন ও প্রাসঙ্গিক। বক্তব্যে, আঙ্গিকে, সংগীতের মেলবন্ধনে যে শিল্পসৃষ্টি তিনি করেছেন তা ভারতীয় সিনেমায় তৈরি করেছে এক নতুন অধ্যায়। ভাবী কালের জন্য তিনি রেখেছেন সত্যনিষ্ঠ বাস্তবধর্মী মহান শিল্পরূপ যা দেখে মানুষ চিন্তার ভাবনার খোরাক পাবে।

৪.২.৪ মৃণাল সেন

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় চলচ্চিত্রের আর এক বিশিষ্ট নয়া বাস্তববাদী পরিচালক হলেন মৃণাল সেন। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের পাশাপাশি অন্যরকম নিজস্ব জায়গা তিনি করে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ স্বকীয় সৃজন ক্ষমতায়, সমাজভাবনায়। ভারতীয় সিনেমায় তিনি এনেছেন নতুন রূপ, নতুন আঙ্গিক, নতুন সমাজবাস্তবতা। রাজনৈতিক সচেতন একটা সম্পূর্ণ নতুন ধারার সিনেমা বিকশিত হয়েছে তার হাতে। মৃণাল সেনের সমাজ দর্শন তার একেবারে

নিজস্ব। শিল্পরচনা তার কাছে কেবল শিল্পের প্রয়োজনেই নয় বরং সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সাথী ওঠায়। সমাজ বাস্তবতাকে তিনি বিশ্লেষণ করেন নিজস্ব স্টাইলে, শিল্পরূপের নির্মাণ করেন এক বিশেষ দার্শনিক বোধের ওপর ভিত্তি করে। ১৯৫৫ থেকে তিনি বেশ কিছু ছবি তৈরি করেছেন এবং প্রতিটি ছবিতেই ঘটেছে এক সমান্তরাল উত্তরণ পর্ব।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

প্রথম ছবি 'রাতভোর' (১৯৫৫)।পরের ছবি 'নীল আকাশের নীচে' (১৯৫৭)। এই ছবির মাধ্যমেই তিনি প্রথম দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মহাদেবী ভার্মার ছোট গল্প অবলম্বনে এই ছবিতে এক চীনা ফেরিওয়ালার গল্প বলা হয়েছে যে কলকাতার এক শিক্ষিত মহিলার সঙ্গে নিছক বন্ধুত্বের টানে জড়িয়ে পড়ে। ভাই বোনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব তৈরি হয় তা ছবিটির আবেদন অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। পরের ছবি 'বাইশে শ্রাবণ' (১৯৫৯)। এই ছবিতে প্রথম দেখা যায় তাঁর সুগভীর বাস্তববোধ। গ্রামের পুরুষ শাসিত সমাজের একটি সাধারণ দম্পতির করুণ কাহিনী পরিচালক চিত্রিত করেছেন। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার লড়াই অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক। এ ছবিতে আছে ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকা। চিত্রকল্প ও মন্তাজ সৃষ্টিতে বাইশে শ্রাবণের কিছু কিছু অংশ অনবদ্য। তাঁর পরের ছবি 'পুনশ্চ' (১৯৬১)। শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক দাম্পত্য সমস্যাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর ১৯৬৫ সালে তৈরি করলেন 'আকাশ কুসুম'। এই ছবিতে গল্প বলার ভঙ্গিমা নিয়ে তিনি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন প্রথাগত শুরু শেষের খেয়াল না রেখে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের যেমন তেমন করে হটাৎ বড়লোক হওয়ার বাসনাকে আক্রমণ করেছিলেন। সামাজিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন। ছবিটি নিয়ে বিশেষ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল এবং তাতে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৬৬ সালে তুললেন ওড়িয়া ভাষায় 'মাটির মানুষ'। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি এই ছবিতে গ্রামের যৌথ পরিবারের ভেঙে যাওয়ার গল্প রয়েছে। সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক মূল্যবোধের সংঘাত সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ১৯৬৯ সালে তৈরি করলেন 'ভুবন সোম'। এই ছবিটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা পায় এবং জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়। এই ছবিতে তিনি এক সম্পূর্ণ নতুন চলচ্চিত্র ভাষা ব্যবহার

করেন। গল্পের বিষয়বস্তুকে এক অপরূপ চিত্রভাষায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এক দাম্ভিক ব্যুরোক্রাট কীভাবে এক সরল গ্রামবধুর সংস্পর্শে এসে জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করলেন তাই বলা হয়েছে এক মনোরম শৈলীতে যা যথার্থই ভারতীয় সিনেমায় নিয়ে আসে নবতরঙ্গ বা নিউ ওয়েভ।

১৯৭০ থেকে মৃণাল সেন দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যরকম ছবি তৈরি করতে শুরু করেন। রূপকের আড়াল থেকে সরে এসে চলচ্চিত্রে তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে সমকালীন বাস্তবতাকে নিয়ে এলেন এবং সামাজিক অন্যায়ের প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'ইনটারভিউ' ছবিতে একটি বেকার ছেলে চাকরি পায় না। ইনটারভিউ দিতে গিয়ে অবান্তর প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। ব্যর্থতাবোধই তাকে নিয়ে যায় নবতর উপলব্ধিতে। গল্প বলার একঘেয়ে গতানুগতিকতা থেকে একটু সরে এসে চিত্রভাষায় এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন। বেকার ছেলেটি বেকারত্বের জন্য আক্রোশে, ক্রোধে ফেটে পড়ে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। শো কেসের কাঁচ ভেঙে চুরমার করে ফেলে একটি পোষাকের মডেলকে। প্রতীকি ব্যঞ্জনায় অসামান্য চিত্রকল্প তৈরি করেন পরিচালক। 'কলকাতা "৭১' (১৯৭২) ছবিতে সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। পাঁচটি আলাদা আলাদা গল্পের মধ্য দিয়ে এক বিশেষ সামাজিক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে এই ছবিতে। ভাবনাটি উঠে আসছে একটি যুবকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের ইতিহাস হল শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র, সামাজিক অন্যায়ের ও অবিচারের পুনরাবৃত্তির ইতিহাস। এরপর ১৯৭৩ এ তৈরি হয় 'পদাতিক'। মৃণাল সেনের রাজনৈতিক মননের যথার্থ পরিচয় পাওয়া গেল এই ছবিতে। ছবিটির পটভূমি কলকাতার আন্দোলন উদ্বেলিত নাগরিক জীবন। জেল পালানো এক তরুণ বিপ্লবী আশ্রয় নেয় এক মহিলার ফ্ল্যাটে এবং ক্রমে আত্মবিশ্লেষণের দৃষ্টিতে বিচার করতে চায় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে, ব্যর্থ বিপ্লবের প্রয়াসকে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এমন সাহসিক প্রযোজনা এর আগে আর হয়নি। ইন্টারভিউ, কলকাতা " ৭১ এবং পদাতিক কে একত্রে ধরা হয় মৃণাল সেনের ত্রয়ী রাজনৈতিক চলচ্চিত্র।

পদাতিকের পরে মৃণাল সেনের উল্লেখযোগ্য ছবি হল 'কোরাস'। এই ছবিটিও ফ্যান্টাসীর সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতাকে নিপুণ দক্ষতায় মিশিয়ে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ছবি। বুদ্ধিদীপ্ত উন্নত ফটোগ্রাফী, অসাধারণ কিছু সিকোয়েন্স এবং চলচ্চিত্র ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগ 'কোরাস'কে এক মহৎ চলচ্চিত্রে পরিণত করেছে। শোষণের সঙ্গে পুঁজিপতিদের সংঘাত জন্ম দিয়েছে এক ঐক্যতানের যার নাম কোরাস। কোরাসের পরবর্তী ছবিগুলিতে আমরা এক ভিন্ন ধরনের সুরের সন্ধান পাই। পরশুরাম, ওকাউরি কথায় দেখি শ্রমজীবি মানুষ, নিচুতলার মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। চলচ্চিত্রে জীবন অ রাজনৈতিক সংগ্রামের কাহিনী থাকলেও মৃণাল সেন তাঁর আত্ম বিশ্লেষণমূলক অভিজ্ঞতায় আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেন। 'আকালের সন্ধানে'ও সেই আত্মসমীক্ষা ও মূল্যবোধের সংকটের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে ওঠে। আবার ব্যবহারিক আঙ্গিকগত দিক দিয়েও সিনেমার মধ্যে সিনেমা নিয়ে এসে এক অসামান্য চমক তৈরি করেন। অন্যান্য ছবি 'একদিন প্রতিদিন', 'খন্ডহর', 'চালচিত্র', 'মহাপৃথিবী', 'অন্তরীণে'ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণক্রিয়াকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন তিনি। 'একদিন প্রতিদিন' ছবিতে হঠাৎ একদিন একটি মেয়ের বাড়ী না ফেরাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া উত্তেজনা , দুশ্চিন্তা , ঈর্ষা, দ্বেষ, মানবিক সহানুভূতি কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তারই বিশ্লেষণ করেছেন। 'খণ্ডহরে' আবার চিত্রিত করেছেন একটি মেয়ের সুগভীর আশা নিয়ে বেঁচে থাকার কাহিনী। ধ্বংসস্তুপ প্রায় একটি বাড়ির প্রেক্ষাপটে মেয়েটির অনাগতের জন্যর প্রতীক্ষা এক সুন্দর রূপকের সৃষ্টি করে। 'মহাপৃথিবী' ও 'অন্তরীণে' তিনি প্রবেশ করেন মানুষের গভীর মননের বিশ্লেষণে। আবার 'আমার ভুবন' ছবিতে তিনি এযাবৎ ছবিতে অবহেলিত মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনধারাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন এক বিশেষ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কবিতার মতো উদ্ভাসিত হয়েছে ভালবাসার জীবন। মৃণাল সেনের দীর্ঘ চলচ্চিত্রজীবনে চলচ্চিত্র তৈরির পরিক্রমায় ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রভূতভাবে সম্পদশালী হয়েছে। তিনি নিজেই

তৈরি করেছেন তাঁর নিজের ঘরানা। সমাজ চিত্রায়নে, রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে, মানবিক সম্পর্কের অনুসন্ধানে তিনি এক নতুন ধরনের ছবি তৈরির প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন যা সব দিক দিয়েই একান্ত নিজস্ব। প্রয়োজনীয় নাটকীয়তা সৃষ্টিতে, মন্তাজের সুষম ব্যবহারে, চিত্রকল্প তৈরির অনির্বচনীয় দক্ষতায় তিনি একজন সৃজনশীল সামাজিক দায়বদ্ধ পরিচালক হয়ে উঠেছেন।

৪.২.৫ তপন সিংহ

বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক উজ্জ্বল স্বকীয় নক্ষত্র তপন সিংহ। সাধারণ দর্শকের প্রতি এক বিশেষ দায়বদ্ধতা থেকে তিনি চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন যখন একের পর এক অসামান্য এবং মেধাবী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে হৈচৈ ফেলে দিচ্ছেন ঠিক তখনই তপন সিংহ একেবারে অন্য মেজাজে ছবি তৈরি করে সাধারণ দর্শকদের মন জয় করে চলেছেন। তার ছবিগুলি এক দিকে যেমন জমিয়ে বৈঠকি গল্প বলে, ঠিক তেমনি অপরদিকে ক্যামেরায়, সংগীতে এবং শব্দ সংযোজনায় সৃষ্টি করে কাব্যময় অপরূপ চিত্রভাষা। দীর্ঘ চার দশক ধরে তিনি বহু চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন যা দেখে আপামর সাধারণ দর্শক মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছে।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

জীবনের শুরুর দিকে তপন সিংহ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এসেছিলেন মূলত শব্দযন্ত্রী হিসেবে। পরে হন চলচ্চিত্র পরিচালক। একের পর এক অসাধারণ ছবি তৈরি করেন। চলচ্চিত্রকার হিসেবে তার উত্তরণ ঘটতে থাকে প্রতিটি ছবির সাথেই। দীর্ঘকাল ধরে ছবি করেছেন। এক একটি ছবির বৈচিত্রের সন্ধানে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছিল অনায়াস বিচরণ। স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার ক্ষমতার ব্যপ্তি, গভীর মনন ও সৃজনশীলতার পরিচয়। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে এ প্রজন্মের বহু বিখ্যাত গল্প, উপন্যাস নিয়ে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অবলম্বনে তিনি তিনটি অসাধারণ ছবি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে ‘কাবুলিওয়ালা’, ১৯৬০এ ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ এবং ১৯৬৫ সালে তৈরি করেন ‘অতিথি’। এই তিনটি চিত্রায়ণে ‘কাবুলিওয়ালা’ ছবিতে তিনি যেমন মানবিক সম্পর্ককে তুলে ধরেছিলেন, ‘অতিথি’ ছবিতে তেমনি তুলে ধরেছেন অনন্য বাঁধনছেঁড়া মুক্তির এক জীবন দর্শন যা সর্বদাই ছুটে বেড়ায়। তপন সিংহের পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টনসিল (১৯৫৬), কাবুলিওয়ালা (১৯৫৭), লৌহকপাট (১৯৫৮), ক্ষণিকের অতিথি (১৯৫৯), ক্ষুধিত পাষাণ (১৯৬০), ঝিন্দের বন্দী (১৯৬১),

হাঁসুলিবাকের উপকথা (১৯৬২), নির্জন সৈকতে (১৯৬৩), জতুগৃহ (১৯৬৪), আরোহী (১৯৬৪), অতিথি (১৯৬৫), গল্প হলেও সত্যি (১৯৬৬), হাটেবাজারে (১৯৬৭), সাগিনা মাহাতো (১৯৭০), হারমোনিয়াম (১৯৭৬), বাঞ্ছারামের বাগান (১৯৮০), সবুজদ্বীপের রাজা (১৯৭৯), আতঙ্ক (১৯৮৬), এক ডক্টর কী মওত (১৯৯১), হুইল চেয়ার (১৯৯৪)। প্রথম ছবি ১৯৫৪ সালে অঙ্কুশ। দুটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন।একটি জগদীশ চন্দ্র বসুকে নিয়ে ১৯৫৮ সালে, অপরটি ১৯৬২ সালে 'আমার দেশ' চীন ভারতের যুদ্ধের সময় তৈরি করেছিলেন। স্বল্প দৈর্ঘ্যের কয়েকটি কাহিনীচিত্রও পরিচালনা করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে আদমি আউর আউরত (১৯৮২) , মানুষ (১৯৮৩) , শতাব্দীর কন্যা (১৯৯৬) , অভাগী (১৯৯৭) ইত্যাদি ছবি।

তপন সিংহের ছবিতে গল্পই প্রধান। আখ্যানধর্মী কুশলী চিত্র নির্মাণকেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বিখ্যাত গল্প উপন্যাসকে কেন্দ্র করে বহু ছবি তিনি তৈরি করেছেন।ক্যামেরায় গল্প বলতে বলতে তিনি মানবিক সম্পর্কের টানাপড়েনকে তুলে ধরেন। মানবিকতাই তার জীবন দর্শন, মানুষের ধর্মকেই তিনি সকলের উপরে স্থান দেন। 'কাবুলিওয়ালা' থেকে 'হুইলচেয়ার' সর্বত্রই তিনি গল্পের আখ্যানের মধ্য দিয়ে মানবিকতাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। যদিও সিনেমার আঙ্গিক নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা - নিরীক্ষা তিনি করেননি। চমক তৈরি করার প্রচেষ্টা সচেতন ভাবে করেন নি। শুধুমাত্র জীবনদর্শনের গভীরতা দিয়ে এবং নান্দনিক বোধ দিয়ে দর্শকদের মন জয় করতে চেয়েছেন। শিক্ষিত মানুষদের কাছে তিনি সমাদৃত হয়েছেন।

ডার্ককমেডির প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ ছিল তপন সিংহের। 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে রবি ঘোষকে দিয়ে যে মজার ছলে জীবন শিক্ষা তিনি দর্শককে দিয়েছিলেন তার তুলনা আজও মেলা ভার। 'হাটে বাজারে' ছবিতেও আছে হাসির উপকরণ। 'হারমোনিয়াম' ছবিতে অনেক মুহূর্তে আছে যা অসামান্য হাস্যরসের যোগান দেয়। আবার সমকালের প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। 'সাগিনা মাহাতো', 'আপনজন' তাঁর উজ্জ্বল প্রতিফলন। প্রত্যেকটি ছবিতেই তিনি সমাজ বাস্তবতাকে ঘটনার অভিঘাতে, সংলাপের নাটকীয়তায় এবং উপযুক্ত ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলে তুলে ধরেছেন। কখনও শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বের সংকট, কখনও দিশাহীন তরুণ ছেলেমেয়েরা, আবার কখনও আধুনিক সমাজে বিচার ব্যবস্থার প্রহসন ও মেয়েদের বিপন্নতাকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আবার 'হারমোনিয়াম' ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব তিনি ছিলেন। সেখানেও এই ছবিতে সংগীতই সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে, এক সমাজ বাস্তবতা থেকে অন্যত্তর সমাজ বাস্তবতায় পৌছে যায় হারমোনিয়াম।

যে কোন মহৎ শিল্পীর মতো তপন সিংহ সহজবোধে চিত্রায়িত করেছেন বাস্তবতা এবং শিল্পকে। বাস্তবকে যখন তুলে ধরেছেন তখন তা একেবারে আটপৌরে বাস্তব ছবি, সকলের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। আবার যখন শিল্প নির্মাণ করেন তখনও তা এক সার্বজনীন ব্যাপ্তি নিয়ে সকলের বোধগম্য হয়ে ওঠে।

এঁদের ভিত্তিপ্রস্তরে গড়ে উঠেছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের আজকের কাঠামো। এছাড়াও বহু পরিচালক তাঁদের নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন সময়ে সময়ে।

৪.২.৬ রাজ কাপুর

ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম শো ম্যান, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রাজ কাপুর এর আত্মপ্রকাশ ১৯৩৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ইনকিলাব চলচ্চিত্রে মাত্র দশ বছর বয়সে। এরপর ১৯৪৮ সালে চব্বিশ বছরের যুবক রাজকাপুর নিজস্ব স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত করেন আর. কে. ফিল্মস নামে। এর সাহায্যেই ঐ সময়ের সর্বকনিষ্ঠ পরিচালক হিসেবে উঠে আসেন ও

'আগ' চলচ্চিত্রে তিনি ও নার্গিস অভিনয় করেন। ১৯৪৯ সালে মেহবুব খানের 'আন্দাজ' চলচ্চিত্রে নার্গিস ও দিলীপ কুমারের সাথে তিনিও অভিনয় করেন। এই ছবিটিই তাঁকে প্রথম ব্যবসায়িক সফলতা দেয় এবং অভিনেতা হিসেবে তার প্রথম স্বীকৃতি লাভ এই ছবির হাত ধরেই। ঐ বছরের শেষদিকে চলচ্চিত্র নির্মাতা, পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে 'বারসাত' চলচ্চিত্রে অসামান্য সফলতা পান। আর.কে. ব্যানারের অধীনে নির্মিত ১৯৫১ সালে 'আওয়ারা', ১৯৫৫ সালে 'শ্রী ৪২০', ১৯৫৬ সালে 'চোরি চোরি' ও 'জাগতে রাহো' এবং ১৯৬০ সালে 'জিস দেশ মে গঙ্গা বেহতি হ্যায়ে'র মতন বেশ কিছুসংখ্যক ব্যবসায়িকভাবে সফল চলচ্চিত্র মুক্তিলাভ করে। ১৯৬৪ সালে তার নির্মিত, পরিচালিত ও অভিনীত আবেগঘন সঙ্গীতধর্মী চলচ্চিত্র 'সঙ্গম' মুক্তিলাভ করে। এটি তার নির্মিত প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র ছিল।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

১৯৭০ সালে তার নির্মাণে, পরিচালনায় ও অভিনয়ে উচ্চাভিলাষী চলচ্চিত্র 'মেরা নাম জোকার' মুক্তি পায় যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক এক্সপেরিমেন্টাল ছবি। এ চলচ্চিত্র নির্মাণে ছয় বছরের অধিক সময় ব্যয় হয়। কিন্তু এই চলচ্চিত্রটি বক্স অফিসে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থতা লাভ করে ও তার পরিবারে চরম আর্থিক বিপর্যয় বয়ে নিয়ে আসে। যদিও পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রটি ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের মর্যাদা পায়। রাজ কাপুর বেশ কিছু সর্বভারতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য তিনবার ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও এগারোবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন। রাজকাপুরের সম্মানার্থে ও তাঁরই নামানুসারে ফিল্মফেয়ারএর আজীবন সম্মাননা পুরস্কারের নাম রাখা হয়। 'আওয়ারা' ও ১৯৫৪ সালের 'বুট পলিশ' কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রাইজের জন্য দুইবার মনোনয়ন পায়। 'আওয়ারা'য় তাঁর অনবদ্য অভিনয়শৈলীর স্বীকৃতি স্বরূপ টাইম ম্যাগাজিন সর্বকালের সেরা দশ অভিনেতার মধ্যে তালিকাভুক্ত করে।

১৯৬৫ ও ১৯৭৯ সালে যথাক্রমে ৪র্থ ও ১১তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। চলচ্চিত্র ও শিল্পকলায় অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৯ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাকে পদ্মভূষণ পদকে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও ১৯৮৭ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভারতের চলচ্চিত্রের

সর্বোচ্চ সম্মাননা দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান তিনি। মৃত্যু পরবর্তীকালে ১৪ ডিসেম্বর, ২০০১ তারিখে ভারতীয় ডাকবিভাগ তার সম্মানার্থে মুখমণ্ডলকে ঘিরে ডাকটিকেট প্রকাশ করা হয়। ২০১৪ সালে গুগল তার ৯০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্মারক তুলে ধরে।

৪.২.৭ গুরু দত্ত

আর এক প্রতিভাবান চলচ্চিত্র অভিনেতা ও পরিচালক গুরু দত্তর জন্ম ১৯২৫ সালের ৯ জুলাই। তার ব্যক্তিগত জীবনের নাম ছিল বসন্তকুমার শিব শংকর পাড়ুকোন। দক্ষিণ ভারতের অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান তিনি। গুরু দত্ত ছিল তার চলচ্চিত্রের নাম। বাবা-মা দুজনেই শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই উত্তরাধিকারের সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠেন তিনি। কলকাতার ভবানীপুরে শৈশব কাটে তার। তিনি বাংলা সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। অনেকটা সেই জন্যই বাঙালি নাম গ্রহণ করে হয়ে গেলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের নক্ষত্র গুরু দত্ত।

গুরু দত্ত ছিলেন একাধারে পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার ও অভিনেতা। এই চার ভূমিকাতেই তিনি ছিলেন সমান সফল। শুধু তাই নয় এটাও মনে করা হয় যে গুরু দত্ত এগিয়ে ছিলেন তার সময়ের চেয়ে। তাঁরই পরিচালিত 'পিয়াসা', 'কাগজ কে ফুল' ছবি দুটিকে বলা হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম সেরা দুই সৃষ্টি। তাঁর পরিচালিত বাকি ছবির মধ্যে রয়েছে 'বাজি', 'বাজ', 'আর পার', 'জাল', 'কাগজ কে ফুল', 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফিফটিফাইভ', 'সয়লাব'। এছাড়াও ছবির প্রযোজনাতেও হাত দেন তিনি , প্রযোজক ছিলেন 'আর পার', 'সিআইডি', 'পিয়াসা', 'গৌরি', 'কাগজ কে ফুল', 'চৌধুরি কা চান্দ', 'সাহেব বিবি অউর গোলাম','বাহারে ফির ভি আয়েগি' ছবির। অভিনেতা হিসেবেও ছিলেন জনপ্রিয়। আজও বলিউডের বিষাদরাজা তিনিই। 'সাহেব বিবি অউর গোলাম'সহ বিভিন্ন ছবিতে তিনি অনবদ্য অভিনয় করেন।

তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'কাগজ কে ফুল' ছবি। এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ওয়াহিদা-গুরু জুটি। যদিও কাহিনি, পরিচালনা, অভিনয় সব দিক থেকে ছবিটি ছিল এক অসামান্য কালজয়ী নজির।

ছবি সৌজন্যে-Wikipedia

কিন্তু বিবাহিত পরিচালকের সঙ্গে নায়িকার প্রেমের কাহিনি সে সময়ের দর্শক মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি। যদিও পরবর্তীকালে ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছে সিনেমাটি। কিন্তু এই ছবির সেই প্রাথমিক ও সাময়িক ব্যর্থতা

আবেগপ্রবণ গুরু দত্তকে বিশেষ ভাবে আলোড়িত করেছিল।

অল্প বয়সে মৃত্যুর আগেও গুরু দত্ত কিছু নতুন ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। এবং 'পিকনিক' ও 'লাভ অ্যান্ড গড' ছবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 'পিকনিক' ছিল তার নিজের ছবি। যেটি শেষ করা হয়নি। 'লাভ অ্যান্ড গড'এর পরিচালক ছিলেন কে. আসিফ। ছবিটি প্রায় দুদশক পর মুক্তি পায়। গুরু দত্তের পরিবর্তে সেটিতে অভিনয় করেন সঞ্জীব কুমার।

৪.২.৮ হৃষিকেশ মুখার্জী

হৃষিকেশ মুখার্জী ছিলেন ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্রের একজন প্রখ্যাত জনপ্রিয় পরিচালক। নিজের চলচ্চিত্র জীবনে তিনি বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবি যেমন 'সত্যকাম', ' চুপকে চুপকে', ' অনুপমা', 'আনন্দ', 'অভিমান', 'গুড্ডি', 'গোলমাল', 'আশীর্বাদ', 'বাবুর্চি', 'নেমক হারাম' প্রভৃতি নির্মাণ করেছেন। অনেকেই তাঁকে বলিউডে অমিতাভ বচ্চনেরও গডফাদার বলে থাকেন, তাঁর হাত ধরেই অমিতাভ বচ্চনের উত্থান! 'আনন্দ' থেকে শুরু করে 'চুপকে চুপকে' হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ন'টি ছবিতে অভিনয় করেছেন অমিতাভ। হৃষিকেশ-অমিতাভ জুটির একের পর এক হিট অনুভবি ছবি এক সময়ে বলিউডে সাড়া ফেলেছিল। 'মিলি', 'জুরমানা', 'নমক হারাম'-

ছবি সৌজন্যে-timesofindia.indiatimes.com

এর মতো ছবিতে একেবারে আটপৌরে ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল বিগ-বি'কে। অনবদ্য গল্প, চিত্রনাট্য আর পরিচালকের হাতযশে এক অন্য অমিতাভ বচ্চনকে পেয়েছিলেন দর্শকরা।

এছাড়াও তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সনদায়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারত সরকার তাকে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার এবং ২০০১ সালে পদ্মবিভূষণ প্রদান করেন। তিনি এনটিআর জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

৪.২.৯ সারাংশ

আমরা এই এককে যাদের বিষয়ে আলোচনা করলাম তারা হলেন:

- সত্যজিৎ রায়
- ঋত্বিক ঘটক
- মৃণাল সেন
- তপন সিংহ
- রাজ কাপুর
- গুরু দত্ত
- হৃষিকেশ মুখার্জী

৪.২.১০ অনুশীলনী

১. ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সত্যজিৎ রায়ের অবদান বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. বাংলা চলচ্চিত্র ঋত্বিক ঘটকের ভাবনায় কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা আলোচনা করুন।

৩. বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নয়া বাস্তববাদের এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪. ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে গুরু দত্ত ও রাজ কাপুরের অবদান ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভারতীয় সিনেমার প্রেক্ষিতে মৃণাল সেনের গুরুত্ব - আলোচনা করুন।

৪.২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

- সোনার দাগ গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ।
- বাংলা সিনেমা অরুণ দাশগুপ্ত।
- বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস মুখোপাধ্যায়।
- History : Bengali cinema Kiranmoy Raha.
- Encyclopaedia of Indian cinema.
- Mass Communication in India, Keval J kumar
- গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি, ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, লিপিকা।
- আধুনিক গণমাধ্যম—ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য বুকস অ্যান্ড এলায়েড।

মডিউল ৪ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস

একক : ৩ ◻ ফিল্ম সেন্সরশিপ

৪.৩.০ গঠন

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

৪.৩.২ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন বা ঙ্খক্ষঙ্খ

৪.৩.৩ ভারতে সেন্সারসিপের প্রাথমিক ইতিহাস

৪.৩.৪ যে যে বিষয়গুলি সেন্সরসিপের আওতাভুক্ত

৪.৩.৫ যে যে বিভাগে সিনেমা সেন্সর হয়ঃ

৪.৩.৬ সিনেমার সেন্সরশিপ পদ্ধতি

৪.৩.৭ উপসংহার

৪.৩.৮ সারাংশ

৪.৩.৯ অনুশীলনী

৪.৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করবো সেই গুলি হলো:

- সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন বা CBFC
- ভারতে সেন্সারসিপের প্রাথমিক ইতিহাস
- যে যে বিষয়গুলি সেন্সরসিপের আওতাভুক্ত
- যে যে বিভাগে সিনেমা সেন্সর হয়
- সিনেমার সেন্সরশিপ পদ্ধতি

৪.৩.২ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন বা CBFC

১৯১৮ সালে ভারতীয় সিনেম্যাটোগ্রাফ আইন পাশ হয়। এই আইনে প্রথম সেন্সরশিপ ও সিনেমার লাইসেন্স প্রথা সম্পর্কিত বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের প্রথম ধাপ সিনেম্যাটোগ্রাফ আইন তৈরি হয়েছিল, যাতে কোনও ছবি কোনওভাবে সামাজিক সীমা লঙ্ঘন না করতে পারে। ভারতীয় চেতনার প্রতি অবমাননাকর কোনও কিছু প্রদর্শন করতে না পারে, বা হিংসাত্মক বিষয় দেখিয়ে কারও ভাবাবেগে আঘাত দিতে না পারে। এখন অনেকের মতেই, শিল্পের কাজ সমাজের সত্যিগুলোকে দেখানো। কিন্তু সেই সত্যিটা কতটা সত্যি

কিংবা শিল্পভাবনা আসলে কতটা সৎ, তাই নিয়ে তর্ক বহুদূর গড়াতে পারে। সেন্সরসিপ শব্দটির মধ্যেই একটি অথরিটি সুলভ সুর আছে, যা নিয়ন্ত্রণ করে ওই অথরিটির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি। শিল্পের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টিই ভীষণভাবে শিল্পের স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারণ করে বলে মনে করা হয়। তাত্ত্বিকভাবে সিনেমায় কি থাকা উচিৎ আর কি থাকা উচিৎ নয় তাই নির্ধারণ করে সেন্সার বোর্ড।

ভারতীয় উপমহাদেশে সেন্সরসিপের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের দ্বারা। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC) ভারতীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ এবং বিধিবদ্ধ সেন্সরসিপ এবং ক্লাসিফিকেশন সংস্থা। এটিকে সেন্সর বোর্ড বলেও অভিহিত করা হয়। সিনেমাসহ টিভি শো, টিভি বিজ্ঞাপন প্রভৃতির সার্টিফিকেশন করে বা শংসাপত্র প্রদান করে CBFC। এককথায় যে সমস্ত অনুষ্ঠান জনসমক্ষে দেখানো হয় তাদের শংসাপত্র প্রদান করে CBFC। ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের আনুষ্ঠানিক মুক্তি সম্ভব হয় সেন্সর বোর্ডের সন্মতির পরেই। প্রধানত সিনেমার উপস্থিত যৌনতা, হিংস্রতা, নগ্নতা যা জনমনে বিরূপ প্রভাব তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হয় তারই বিচার করে CBFC। বস্তুত বাকস্বাধীনতার বিরোধিতা নয়, বরং বাকস্বাধীনতার সংবিধান লিপিবদ্ধ বিধিনিষেধগুলিকে মান্যতা দিয়েই সিনেমায় সেন্সর আরোপ করা হয়।

ছবি সৌজন্যে-jaganrosh–com

CBFC সম্পর্কে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য হল, “ফিল্ম সেন্সরসিপ খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে কারণ ছাপার অক্ষরের তুলনায় সিনেমা তীব্রভাবে মানুষকে আকর্ষণ করে এবং ভাবনা ও কাজের বদল ঘটায়। সিনেমা, সংলাপ, দৃশ্য ও শব্দের সমন্বয়ে তৈরী সিনেমা থিয়েটারের আঁধারে দর্শকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং মানসিক অনুভূতির ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও সিনেমার ভালোর তুলনায় খারাপ প্রভাব বেশি এবং সিনেমা সহজেই হিংস্রতা ও অস্বাভাবিক ব্যাবহারের জন্ম দেয়। এটা কখনই জনসংযোগের অন্যান্য মাধ্যমের সাথে তুলনীয় নয়।”

৪.৩.৩ ভারতে সেন্সারসিপের প্রাথমিক ইতিহাস

১৯১৩ সালে দাদাসাহেব ফালকের “রাজা হরিশচন্দ্র” মুক্তি পায়, আর ১৯১৮ সালে পাস হয় সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট, যা কার্যকরি হয় ১৯২০ সালে। সেইসময় চেন্নাহি, মুম্বাই, কলিকাতা, লাহোর এবং রেঙ্গুন পুলিশের অধীনে

ছিল সেন্সর বোর্ডগুলি। স্বাধীনতার পর Bombay Board of Film Censors এর আওতায় চলে আসে স্বাধীন প্রাদেশিক সেন্সর বোর্ডগুলি। ১৯৫২ সালের সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্টের পর 'বম্বে বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সরস' নবরূপে 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সরস' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৩ সালে সিনেম্যাটোগ্রাফ সার্টিফিকেশনের নিয়মনীতির সংশোধন হয়, ও তখন থেকেই 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সরস' নতুন নাম 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন' নামে পরিচিত হতে শুরু করে।

৪.৩.৪ যে যে বিষয়গুলি সেন্সরসিপের আওতাভুক্ত

ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৯১৮ সালে সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর প্রদর্শিত সিনেমাগুলি ছিল হয় আমেরিকান নয়তো ব্রিটিশ। সেইসময় নগ্নতা,নারীর মদ্যপ অবস্থার দৃশ্য, যৌনতা এবং রাজনৈতিক আদর্শগত সংঘাত এই বিষয়গুলিই সেন্সরের আওতায় পরত। ১৯২৭ সালে ভারতীয় সিনেম্যাটোগ্রাফ কমিটিতে প্রথম একজন ভারতীয় যোগ দেন, তিনি হলেন টি রঙ্গচারিয়ার। তিনি নিয়োগের দু বছর পরে একটি রিপোর্ট দেন সিনেমায় সেন্সরসিপ কতটা জরুরী এই মর্মে। যুদ্ধকালীন সময়ে সেন্সরসিপের বিষয়টি বিশেষ মাত্রা পায়। উল্লেখ্য ভারতীয় সিনেমায় সেন্সরের বিষয়টির সূচনা হয় ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ে, তাই সেন্সরসিপের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছিলো, ১৯৫২ সালে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সরস শুরু হলেও সেই রীতির পরিবর্তন হয় নি, অর্থাৎ ১৯১৮ সালে থেকে এখনও অবধি ভারতীয় সিনেমার সেন্সারসিপ নির্ধারিত হয় ব্রিটিশ ট্র্যাডিশন অনুসরণ করেই। এখন সিনেমার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের যে যে কারণগুলি উঠে আসে সেগুলি হল, ১) যৌনতা, ২) রাজনীতি, ৩) ধর্মীয় কারণ, ৪) সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, ৫) কোনও ব্যক্তি বা ঘটনা বা বিষয়ের ভুল উপস্থাপন, ৬) অতিরিক্ত হিংস্রতা।

১) যৌনতাঃ ভারতীয় উপমহাদেশ যে রক্ষণশীল অনমনীয় সমাজব্যবস্থা অনুসরণ করে সেখানে বিবাহোত্তর স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্বীকৃত।বিবাহই যৌন সম্পর্কের একমাত্র সমাজ স্বীকৃত পথ। অথচ বিবাহ ছাড়াও যে যে ধরণের যৌন সম্পর্কগুলি হয় তা হল, সমকামিতা। কিন্তু এই সম্পর্কগুলি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত। এই পরিস্থিতিতে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে যৌনদৃশ্যের উপস্থাপন সহজেই সেন্সরের কোপে পরে, এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি হল, এই দৃশ্য ভারতীয় মূল্যবোধের অবনমন ঘটাতে পারে। এই কারণে যে সমস্ত সিনেমাগুলি সেন্সরের কোপে পরেছে এগুলি হল, 'কামসুত্র', 'ফায়ার', 'পিঙ্ক মিরর', 'দ্য গার্ল উইথ দ্য ড্রাগন ট্যাটু', 'ওয়াটার' প্রভৃতি।

২) রাজনীতিঃ সেন্সরসিপের থেকে রাজনীতিকে আলাদা করা প্রায় একপ্রকার অসম্ভবই। বাস্তবে দেখা যায় সিনেমায় আলোচিত রাজনৈতিক ঘটনাবলী তৎকালীন ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রত্যক্ষ্যভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং যে দল সিনেমার একটি চরিত্র তার দ্বারা সিনেমাটিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে প্রথম রাজনৈতিক কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল মৃণাল সেনের "নীল আকাশের নিচে"। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয় এই সিনেমার প্রেক্ষাপট হওয়ার কারণে বাংলা ভাষায় নির্মিত এই সিনেমাটি প্রথম ভারতীয় সিনেমা হিসেবে ভারত সরকারের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়। এছাড়াও মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা নিয়ে ১৯৬৩ সালে নির্মিত 'গোকুল শঙ্কর'ও ভারত সরকারের দ্বারা নিষেধাজ্ঞার কবলে পরে। রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ আরও কয়েকটি সিনেমা হল, 'গরম হাওয়া', 'আঁধি', 'কিসসা কুরশি কা'। নিষেধাজ্ঞার কবলে পরেছিল অস্কার বিজয়ী বাঙালি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্র, "সিকিম"। সিকিমের তৎকালীন রাজা সত্যজিৎ রায়ের এই তথ্যচিত্র নির্মাণ অনুমোদন করেন যখন সিকিম ভারত এবং চীন দুই দেশের তরফ থেকেই বিপদের

আশঙ্কা করছিল। উল্লেখ্য এই তথ্যচিত্রের জন্য সেন্সরসিপ বোর্ডের ডিরেক্টরের কাছে তাদের নির্ধারিত ৫১টি 'অবজেকশন' ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিলো সত্যজিৎ রায়কে। ১৯৭৩ সালে সিকিম ভারতের সাথে যুক্ত হওয়ার পরেই তথ্যচিত্রটি ভারত সরকারের তরফে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, সেই নিষেধাজ্ঞা ২০১০ সালে ওঠে। এই শতাব্দীতে রাজনৈতিক কারণে বাধাপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য দুটি সিনেমা হল, 'অরক্ষণ', 'উড়তা পাঞ্জাব'।

৩)ধর্মীয় কারণঃ ধর্মীয় কারণ এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে যেকোনো গণমাধ্যমের একচুল একদিক ওদিক করাও উদারতার সাথে গ্রহণ করেনি ভারতীয় সেন্সর বোর্ড। ধর্মীয় ভাবনা তো বটেই, ধর্মীয় চরিত্রও এক্ষেত্রে সেন্সরের আওতায় পরে। ১৯৮৪ সালে নির্মিত আমেরিকান অ্যাডভেঞ্চার "ইন্ডিয়ানা জোন্স অ্যান্ড দ্য টেম্পল অফ ডুম" ভারত সরকারের দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিলো, কারণ এখানে হিন্দু দেবী কালীকে অন্ধকার জগতের দেবী হিসেবে দেখানো হয়েছিলো। যদিও পরবর্তিকালে বিখ্যাত আমেরিকান লেখক Yvette Claire Rosser তীব্রভাবে এই সিনেমাটির সমালোচনা করে বলেন, এতে আদপে ভারতীয়ের ভারতীয়দের মতো করে উপস্থাপন করা হয় নি, বরং পশ্চিমিদের চোখে ভারতীয়রা কেমন সেটা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ধর্মের কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিদেশী সিনেমা হল, 'The Da Vinci Code'। সাম্প্রতিককালে ভারতে নির্মিত যে সিনেমা ধর্মের কারণে প্রচুর সমস্যায় পরেছিল তা হল, 'PK'।

৪) সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ঃ ভারতের মতো বহু ধর্মের দেশে ধর্মীয় ভাবাবেগের মতো সংবেদনশীল যে বিষয়টি তা হল সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ। যে কারণে অনেক সিনেমা, তথ্যচিত্র সেন্সর বোর্ডের কোপে পরে। এই ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্রগুলি হল, গুজরাট দ্বাঙ্গা নিয়ে নির্মিত 'Final Solution'। সিনেমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'Hawayein' , 'Amu' (কিছু অডিও ক্লিপ বাদ দিয়ে সিনেমাটি মুক্তি পায়), 'বিশ্বরূপম' প্রভৃতি।

৫) কোনও ব্যক্তি বা ঘটনা বা বিষয়ের ভুল উপস্থাপন: বিখ্যাত বা কুখ্যাত মানুষ সম্পর্কে ভুল তথ্য উপস্থাপন করার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া ভারতীয় সিনেমার তালিকাটিও খুব ছোটো নয়। ফুলদেবীর জীবনী নির্ভর সিনেমা 'Bandit Queen' সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, কারণ ফুলন দেবী নিজেই এই সিনেমার সত্যতা নিয়ে দিল্লী হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। 'Main Hoon Rajinikanth' দক্ষিনি সুপারস্টার রজনীকান্তের জীবনীনির্ভর এই সিনেমাটি স্বয়ং রজনীকান্তের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলো। সিনেমাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষিত করতে তিনি হাইকোর্ট অবধি গিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সিনেমা 'যোধা-আকবর' এবং 'পদ্মাবত'ও মুক্তির আগে তীব্র বিরোধিতা ও সমালোচনার মুখে পরলেও পরে মুক্তি পায়।

৬) অতিরিক্ত হিংস্রতাঃ সিনেমা দেখার অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল এটি বিনোদন মাধ্যম। জীবনের গল্প তুলে ধরার আঙ্গিকে সিনেমা হিংস্রতা তুলে ধরলেও তা যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় তখনই সেখানে সেন্সরের কোপ পরে। সিনেমার অতিরিক্ত হিংস্রতা দর্শকদের মানসিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলেই মনে করা হয়। অতিরিক্ত হিংস্রতা থাকার কারণেই অনুরাগ কাশ্যপের সিনেমা 'Paanch' আজও মুক্তি পায়নি। যদিও সেন্সর বোর্ড কিছু ক্লিপ বাদ দিয়ে সিনেমাটির মুক্তির অনুমতি দিলেও তা আর মুক্তি পায়নি।

৪.৩.৫ যে যে বিভাগে সিনেমা সেন্সর হয়

একটি সমীক্ষাতে দেখা গেছে, ভারতে প্রায় ১২৫০ সিনেমা নির্মিত হয় প্রতি বছর। সিনেমা থেকে প্রাপ্ত করের পরিমাণ প্রায় ১৩,৮০০ কোটি টাকা, ২০২০ তে তা প্রায় ২৩,৮০০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা

হচ্ছে। বিপুল সংখ্যায় নির্মিত ভারতীয় সিনেমা আগে দুটি বিভাগে মুক্তি পেত, কিন্তু ১৯৮৩ সালের জুন মাস থেকে বিভাগ সংখ্যা বেড়ে হয় ৪। এখন সিনেমা যে চারটি বিভাগে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনুমদিত হয় সেগুলি হল, U– U/A– A এবং ছ।

ইউ সার্টিফিকেট বা (uninterrupted)ঃ সব বয়সের সব ধরণের দর্শকের দেখার উপযোগী হয় এই ধরণের সিনেমা। এতে যৌনতা, হিংস্রতা ইত্যাদি বিষয়গুলি থাকেই না। পুরো পরিবারের সাথে বসে দেখার উপযোগী হল এই সার্টিফিকেট পাওয়া সিনেমাগুলি।

U/A সার্টিফিকেট বা / ঃ এই ধরণের সিনেমা সর্বসাধারণের জন্যই নির্মিত। এবং এতে সব ধরণের বিষয়ই থাকে। সব ধরণের দর্শকের জন্য হলেও, ১২ বছরের নিচের দর্শকের জন্য দেখার সময় অভিভাবক সাথে থাকা বাধ্যতামূলক। মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার বেশিরভাগই এই সার্টিফিকেটটাই পায়।

A সার্টিফিকেট বা (Adult)ঃ এই ধরণের সিনেমা প্রাপ্ত বয়স্কদের উপযোগী বিষয় ও দৃশ্য দিয়ে তৈরি হয়। ১৮ বছরের উর্দে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্করাই এই সিনেমার দর্শক হতে পারে। যৌনতা, অতিরিক্ত হিংস্রতা, গালিগালাজ থাকলে সে ছবি 'এ' সার্টিফিকেট পায়। যদিও বেশ কিছু ছবিতে কখন কখন এমন দৃশ্যের প্রয়োজন হয় , যেখানে যৌনতার ছোঁয়া রয়েছে বা এমন সংলাপ রয়েছে যেটা অপমানজনক, অথচ প্রাত্যহিক জীবনে প্রায়ই শোনা যায় বা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক, তাহলে সে ছবি 'ইউ/এ পেতে পারে। আবারএমনও অনেক সময় হয়, যে ছবিতে হয়তো কোনও প্রথাগত আপত্তিকর দৃশ্য নেই, অথচ ছবির বিষয়বস্তু গুরুতর ও গম্ভীর, যেমন পাচারচক্র বা মাদকচক্র তাহলেও ছবিকে 'ইউ/এ' দেওয়া হয়।

S সার্টিফিকেট বা ঃ বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এই ধরণের সিনেমা।

বিদেশী সিনেমা, বা বিদেশী তথ্যচিত্রর এদেশে মুক্তির বিষয়ে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের কোনও সার্টিফিকেট দেয় না। কিন্তু দেশেরেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে নিয়মের একটু অদল-বদল হয়। এগুলো নির্ভর করে সেই জায়গার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর। যেমন দক্ষিণ ভারতের ছবিতে অনেক বেশি হিংসা থাকলেও সে ছবি 'ইউ/এ' পেয়ে থাকে অনেকসময়। কারণ ওখানের দর্শক তাতে অভ্যস্ত। অথচ সেই একই ছবির হিন্দি রিমেক 'এ' সার্টিফিকেট পেতে পারে। কারণ বৃহত্তর ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে দর্শক অতটা হিংসা ছবির পর্দায় দেখতে অভ্যস্ত নন।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা ছবি সম্পূর্ণ নাকচ হয়ে যেতে পারে নির্দেশিকা অনুযায়ী। যেমন কোনও ছবি যদি সরাসরি সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ায় বা ছড়াতে প্রভাবিত করে, তাহলে সেটা পাশ হবে না। বা কোনও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব বা ধর্মগুরু সম্পর্কে কোন অসত্য এবং অপমানজনক কথা বললে, সেটাও পাশ হবে না। বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের অসন্মান করে কিছু দেখালে, সেটা পাশ হবে না। বাচ্চাদের উপর হিংস্রতা, অত্যাচার, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে কাউকে গুলি করা আর শরীরে ড্রাগ ইনজেক্ট করার দৃশ্য দেখানো যায় না।

৪.৩.৬ সিনেমার সেন্সরশিপ পদ্ধতি

বোর্ডে মোট সদস্য থাকেন ৫০ জন। যে কমিটি ছবিগুলোকে রিভিউ করে, তাতে একজন অভ্যন্তরীণ অফিসার থাকেন। আর তাঁর সঙ্গে থাকেন চার জন উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এই বোর্ড গঠন করা হয়।

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রক এই বোর্ড তৈরি করে। নিয়ম অনুযায়ী, যার এক চতুর্থাংশ মহিলা থাকার কথা। বোর্ডের শীর্ষে থাকেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। তাঁর নীচে রয়েছে একটা এগজামিনিং কমিটি। তারপর বিভিন্ন রিজিওনাল অফিসার। তারপর আঞ্চলিক এগজামিনিং কমিটি। বর্তমানে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের চেয়ারম্যন প্রসূন যোশী। CBFC সদরদপ্তর মুম্বাইতে হলেও এর নয়টি আঞ্চলিক শাখা রয়েছে। সেগুলি আছে, মুম্বাই, কলকাতা, ত্রিবান্দাম, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, কটক, গুয়াহাটি এবং দিল্লীতে।

শুরুর দিকে ১৯৫২ সালের সিনেম্যটোগ্রাফ আইনের ৪১তম নিয়ম অনুসারে একটি সিনেমার সার্টিফিকেট পেতে সময় লাগতো কমবেশি ৬৮ দিন। বর্তমানে তা অনেকটাই কম লাগে। ১০০ টাকা প্রতি রিল মুল্যে সিনেমার প্রযোজককে প্রথমে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের অ্যাপ্লিকেশন ভর্তি করতে হয়। সিনেমার একজামিন কমিটিতে চার জন সদস্য থাকেন অ্যাডভাইজারি প্যানেল থেকে এবং একজন একজামিন অফিসার থাকেন। শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে একজন থাকেন অ্যাডভাইজারি প্যানেল থেকে এবং একজন একজামিন অফিসার থাকেন। সম্পুর্ণভাবে নির্মিত সিনেমা পাঠাতে হয় সেন্সর একজামিন প্যানেলে। ১৯৮৩ সালের সংশোধনী আইন অনুসারে ফিল্ম সার্টিফিকেশনের সমস্ত তথ্য এবং রেকর্ডস, ফিল্মের প্রিভিউ সব গোপনীয় বলে মানতে হবে। ফিল্ম একজামিন কমিটির কোনও সদস্যের পরিচয় কোনও অফিসিয়াল, নন-অফিসিয়াল বা প্রিভিউ হওয়া সিনেমার আবেদনকারীর কাছে প্রকাশ করা চলবে না কোনও অবস্থাতেই। ফিল্ম প্রিভিউ থিয়েটারে উপস্থিত থাকতে পারবেন না প্রিভিউ হওয়া সিনেমার আবেদনকারী স্বয়ং বা তার তরফের কোনও ব্যক্তি। প্রিভিউএর তিনদিনের মধ্যে একজামিন কমিটির সমস্ত সদস্যদের মতামত পাঠানো হয় একজামিন অফিসার পাঠান সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের চেয়ারম্যনের কাছে। তার পরের সাতদিনের মধ্যে প্রযোজক জানতে পারেন সিনেমাটি কোন সার্টিফিকেট নিয়ে মুক্তি পেতে চলেছে। এই পর্যায়েই কোনও সিনেমার ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারী হয়। অবশ্য তার আগে বোর্ডের তরফ থেকে আপত্তিকর শব্দ/বিষয়/বা ক্লিপ বাদ দেওয়ার আবেদন রাখা হয়। প্রযোজকের তরফ থেকে অনেক সময় তা মেনে নেওয়া হয় আবার কিছু সময় প্রযোজক সেটা না মেনে আর একবার দেখার জন্য আবেদন জানান। তখন রিভাইজিং কমিটি দ্বিতীয়বারের জন্য সিনেমাটি দেখে।

এই রিভাইজিং কমিটি তৈরি হয় সম্পুর্ন নতুন সদস্যদের নির্মিত প্যানেল নিয়ে। এতে থাকেন একজন চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যনের নির্ধারিত অনধিক ৯ সদস্য। তবে এই সদস্যদের মধ্যে তাঁরা থাকতে পারেন না যারা একজামিন প্যানেলে ছিলেন। অর্থাৎ একটি সিনেমার জন্য একজামিন প্যনেল এবং রিভাইজিং প্যানেলের সদস্য কখনও একই ব্যাক্তিরা হতে পারেন না। সিনেমা দেখার তিনদিনের মধ্যে সদস্যদের মতামত প্রিসাইডিং অফিসার পৌঁছে দেন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের চেয়ারম্যনের কাছে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের বিরোধিতার জায়গাগুলি শোনে দিল্লীতে অবস্থিত Film Certification Appellate Tribunal (FCAT).

প্রসঙ্গত, এই "গোপনীয়" শব্দবন্ধটি যুক্ত হয় ১৯৮৩ রামকৃষ্ণ সিনে স্টুডিও এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের একটি মামলা হয় যার বিষয় ছিল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনকে জানাতে হবে কি কারণে একটি সিনেমা সেন্সরসিপের বিচারে সার্টিফিকেট পেলো না, তাতে মাদ্রাজ হাইকোর্ট যে রায় দেয় তা হল, ''The Central Board of Film Censors has to come out with specific reasons when it asks for cuts in a film and it must also furnish the particulars of guidelines under which cuts are sought to be effected to the film producer. If for any reason– the members of Committees (Examining or Revising) felt that any particular portion of film has to be cut– there could not be any òconfidentialityó about these opinions especially when the privilege was not claimed on the ground of public interest."

এ তো গেলো সিনেমা মুক্তির সহজ পদ্ধতি। কিন্তু এরপরেও অনেক সিনেমার মুক্তির ক্ষেত্রে অনেক রকম বাধা আসে। সেই বাধাগুলি আসে জনতার কাছ থেকেই। অনেকেই হাইকোর্টে সিনেমা মুক্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দাবী করে মামলা করে, অনেক সময় রাজনৈতিক দল সিনেমার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, বাধা দেয় হলে সিনেমা মুক্তি পেতে। সুতরাং, একথা বলাই যায় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের ছাড়পত্রই সিনেমা মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে শেষ কথা নয়। সাম্প্রতিক অতীতে সেন্সরসিপের কোপে পরা কিছু সিনেমা হল, 'রং রশিয়া', 'মেসেঞ্জার অফ গড', 'ফিরিঙ্গি', 'যব হ্যারি মেট সেজেল', 'পদ্মাবত', প্রভৃতি।

৪.৩.৭ উপসংহার

সবার শেষে একটা কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই যে, সেন্সরসিপ সভ্য মানুষের তৈরি শিল্পকর্মের ওপর মানুষ প্রদত্ত বাধা। যেহেতু কোনও শিল্পকর্মকে দেশ কালের সীমারেখায় বাঁধা যায় না তাই আজ যা সেন্সরসিপের আওতায় আসে, কাল তা নাও আসতে পারে। বা আজ যা সেন্সরসিপের আওতায় আসার মতো জরুরী বলে মনে হয় না কাল তা সেন্সরসিপের তালিকায় ভীষণ গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠতেই পারে। এ ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী কোনও সিদ্ধান্তে আসা সেন্সরসিপের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষটির প্রতি অবিবেচনার সামিল বলেই মনে করা উচিৎ। সেইকারনেই সময়ের সাথে সাথে সেন্সরসিপের বিষয় পরিবর্তন ও সংশোধন করাও জরুরী।

৪.৩.৮ সারাংশ

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করলাম সেই গুলি হলো:

- সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন বা CBFC
- ভারতে সেন্সারসিপের প্রাথমিক ইতিহাস
- যে যে বিষয়গুলি সেন্সরসিপের আওতাভুক্ত
- যে যে বিভাগে সিনেমা সেন্সর হয়
- সিনেমার সেন্সরশিপ পদ্ধতি

৪.৩.৯ অনুশীলনী

১. ভারতীয় চলচ্চিত্রে সেন্সরশিপের ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. চলচ্চিত্রে সেন্সরশিপের গুরুত্ব ও প্রয়োজন আলোচনা করুন।

৩. ভারতীয় চলচ্চিত্রে সেন্সরশিপের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

৪. ভারতীয় সেন্সরবোর্ডের কাঠামো বর্ণনা করুন।

৪.৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

- সোনার দাগ গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ।
- বাংলা সিনেমা অরুণ দাশগুপ্ত।
- বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস মুখোপাধ্যায়।
- History - Bengali cinema Kiranmoy Raha.
- Encyclopaedia of Indian cinema.
- Mass Communication in India– Keval J kumar
- গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি, ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, লিপিকা।
- আধুনিক গণমাধ্যম : ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, লিপিকা।

মডিউল-৪ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস

একক : ৪ ◻ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস

৪.৪.০ গঠন

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

৪.৪.২ শুরুর কথা

৪.৪.৩ যাত্রাপথ

৪.৪.৪ স্বাধীনতা পরবর্তী পালাবদল

৪.৪.৫ সারাংশ

৪.৪.৬ অনুশীলনী

৪.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করবো সেই গুলি হলো:

- বাংলা চলচ্চিত্রের শুরুর কথা
- বাংলা চলচ্চিত্রের যাত্রাপথ
- স্বাধীনতা পরবর্তী পালাবদল

৪.৪.২ শুরুর কথা

পুরো পৃথিবী জুড়েই, সিনেমা বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝানো হতো বায়োস্কোপকে। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সাথে সমান ভাবে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে গেছে সময়ের হাত ধরে। বহু গুণী জনের প্রতিভায় অনন্য হয়ে নিজস্ব ইতিহাস রচনা করেছে বাংলা চলচ্চিত্র। উনিশ শতকের একদম শেষের দিকে, বাংলায় প্রথম বায়োস্কোপের দেখা মেলে। ১৮৯৮ সালে, প্যারিসের চলচ্চিত্র প্রেমী অধ্যাপক স্টিভেনসনের একটি স্বল্পদীর্ঘ ছবি কলকাতার স্টার থিয়েটার এ প্রথম দেখানো হয়। এই স্টিভেনসনের ক্যামেরা ধার করে নিয়েই বাংলা চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেন বানান তার প্রথম ছবি, 'Dancing Scene From the Opera–The Flower of Persia'। পরে সহোদর মতিলাল সেনের সাহায্যে লন্ডনের ওয়ারউইক ট্রেডিং কোম্পানির চার্লস আরবানের থেকে তিনি নিজের জন্য একটি আরবান বায়স্কোপ কিনে নেন। পরের বছর তিনি ভাইয়ের সাথে রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানীর গোড়াপত্তন করেন। এভাবেই বাংলা চলচ্চিত্রের পথচলা শুরু হয়, মোটামুটি অনাড়ম্বর ভাবেই কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের সাথে তাল মিলিয়ে। আপাতভাবে শুরুর দিনে যা একদমই যান্ত্রিক উদ্ভাবন

ছিল সেই চলচ্চিত্র ক্রমে ক্রমে অন্যতম শিল্পমাধ্যম হয়ে স্থান করে নিয়েছে সমস্ত বাংলায়। স্থান থেকে কাল, কাল থেকে কালান্তরে সিনেমার অনায়াস যাতায়াত। সিনেমার দৃশ্য ও শব্দের ধারাবাহিক মূর্ত থেকে ভেসে যাওয়া যায় বিমূর্ত নিরপেক্ষ চেতনায়।

৪.৪.৩ যাত্রাপথ

বাংলায় চলচ্চিত্রের সূচনা ১৮৯০ সাল থেকে যখন কলকাতার থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানো হল এবং তার ঠিক একদশকের মধ্যেই আজকের এই 'টলিউড' বা বাংলা ইন্ডাস্ট্রির বীজবপন করেন হীরালাল সেন। তিনি রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে কলকাতার স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার ইত্যাদিতে জনপ্রিয় শো দেখাতেন যা জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিল প্রথাগত শিল্প মাধ্যমের বাইরে। হীরালাল সেন সর্ব প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যর চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনী শুরু করেন কোলকাতা ও অন্যান্য স্থানে। তখনকার ঢাকা জেলায় ১৮৬৬ সালে হিরালাল সেন জন্মগ্রহণ করেন। এই পথপ্রদর্শক বাঙালি চলচ্চিত্রকারকে সারা ভারতবর্ষের এবং উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক বলে গণ্য করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়ন কালেই তিনি ছবি তৈরির কাজে নিজের উৎসাহ খুঁজে পান। হীরালাল সেন প্রথমে বিদেশী কলাকুশলীর সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং কিছুকাল কাজ শেখার পর তিনি নিজেই পরে একটি ক্যামেরা তৈরি করেন (মুভি ক্যামেরা কেনার মতন অর্থ তাঁর ছিল না) এবং ওই ক্যামেরা দিয়েই তিনি প্রথম ছবি তৈরির কাজ শুরু করেন। আদতে ফোটোগ্রাফার হীরালাল সেন ও তাঁর ভাই মতিলাল সেন তাঁদের 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' থেকে পেশাদার মঞ্চে অভিনীত বিভিন্ন নাটকের টুকরো টুকরো দৃশ্য, ডকুমেন্টরি বিজ্ঞাপন চিত্র এবং নিউজ রিল মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটির বেশি ছবি করেছেন।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি তাঁর প্রথম পরিচালনার ছবি 'আলিবাবা অ্যান্ড ফরটি থিভস' মুক্তি পায়। এই হীরালাল সেনেরই একক প্রচেষ্টায় কলকাতায় ক্ল্যাসিক থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ভ্রমর' ('কৃষ্ণকান্তের উইল') সিনেমাটি পর্দায় প্রদর্শিত হয়। এই সেন ভাতৃদ্বয়কে যথার্থ ভাবেই তাই বলা হত ভারতের লুমিয়ের ব্রাদার্স। ১৯১৭ সালে কলকাতায় মারা যাবার আগে পর্যন্ত হীরালাল সেন বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হীরালাল সেনের পর জ্যোতিষ চন্দ্র সরকার নামে একজন বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি সে সময় ভারতীয় রাজনীতিবিদ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্ব ও পরিচালনায় 'অ্যান্টি পার্টিশন ডে' এর শোভাযাত্রাটির ছবি তুলেছিলেন।

এরপর সাময়িক বিরতির পর হাল ধরেন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। তিনি ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যা বাঙালি মালিকানার প্রথম ফিল্ম কোম্পানি (১৯১৮)। ভারতের প্রথম নির্বাক বাংলা ছবি :- ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা কাহিনিচিত্র 'সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র'। বাংলা ভাষায় তৈরি প্রথম ফিচার ফিল্ম ছিল 'বিল্বমঙ্গল' যেটি ১৯১৯ সালে ম্যাডান থিয়েটারের ব্যানারে নির্মিত হয়। 'বিলাত ফেরত' ছিল আইবিএফসি''র প্রথম প্রযোজনা (১৯২১)। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সবাক বাংলা ছবি 'জামাইষষ্ঠী', জে. এফ. ম্যাডান প্রযোজিত 'ম্যাডান' থিয়েটারে প্রদর্শিত হয় যার পরিচালনায় ছিলেন অমর চৌধরী। এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত 'দেনা পাওনা' চলচ্চিত্রটি ছিল বাংলার প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। এই বছরই নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই নব প্রতিষ্ঠানেরই প্রথম সবাক ছবি 'দেনা পাওনা' ১৯৩১ সালের ২৪ ডিসেম্বর চিত্রায় মুক্তি পায় (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের)। এ বছরেই আরো কয়েক মাসের মধ্যে ম্যাডান কোম্পানি আরো ৩টি পূর্ণাঙ্গ সবাক চিত্র 'জোর বরাত', 'ঋষির প্রেম', 'প্রহ্লাদ' ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের কৌতুক চলচিত্র 'তৃতীয় পক্ষ' উপহার দিয়ে সবাক ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি

করেন। বলা যায়, বাংলা সবাক ছবির সূচনা হয়েছিল ম্যাডান কোম্পানি সৌজন্যে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ম্যাডানের তোলা ছবির সংখ্যা ছিল ৬১ (বাংলা ১০ ও হিন্দি ৫১)।

নির্বাক ছবির যুগে বাঙালি পরিচালক অনাদি বসু মফস্বল শহরে চলমান সিনেমার মারফত ছবি দেখানো প্রথম প্রবর্তন করেন। বাঙালি শিল্পীদের নিয়ে তিনি ১৯১৮ সালে পূর্ণাঙ্গ বাংলা নির্বাক ছায়াছবি 'রত্নাকর' তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। প্রাথমিক বিনিয়োগে নির্বাক ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজকদের অভাব না থাকলেও সবাক ছবির প্রথম যুগে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বিশেষ কেউ চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসেন নি। তাই সবাক যুগের প্রথম দুবছর ম্যাডান ও নিউ থিয়েটারস ছাড়া কলকাতার চিত্র জগতে আর কেউই এগিয়ে আসেন নি ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে।

সবাক ছবির প্রথম দশকেই দেবকী কুমার বসু, সুশীল মজুমদার, প্রমথেশ বড়ুয়া, প্রফুল্লা রায়, চারু রায়, মধু বসু, ফণী মজুমদার, নীতিন বসু প্রমুখ যশস্বী পরিচালক বাংলা চিত্র জগৎকে গৌরবের আসনে অলঙ্কৃত করেন। চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ব্যবহার সাড়া ফেলেছিল এবং সঙ্গীত জগতের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন রাইচাদ বড়াল ও তার সহকারীরা। সে আমলে সবাক যুগের শ্রেষ্ঠ ১০ টি ছবির নাম করা যেতে পারে। ছবিগুলো হলো- চন্ডিদাস (১৯৩২), দেবদাস (১৯৩৫), গৃহদাস (১৯৩৬), আলীবাবা (১৯৩৭), মুক্তি (১৯৩৭), বিদ্যাপতি (১৯৩৮), গোরা (১৯৩৮), দেশের মাটি (১৯৩৮) ও অধিকার (১৯৩৯)। দেবকী বসু পরিচালিত চন্ডিদাস ও প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত দেবদাস ও গৃহদাহ সাহিত্যের সঙ্গে সে যুগে চলচ্চিত্রের এক সেতুবন্ধন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। এই দুটি ছবিতেই বড়ুয়ার প্রতিভার স্বাক্ষর আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। এছাড়াও তিরিশ দশকে দেবকী বসু পরিচালিত 'চন্ডিদাস' ছবিটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় পরিচ্ছন্ন এক কাব্যিক পরিবেশ গড়ে দর্শকের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। শুধু তাই নয় এই ছবিতেই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রে আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার চলচ্চিত্রের এক নব দিগন্তের দ্বার খুলে দেয়। এই সময়ে আরো যেসব উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল নরেশ মিত্র পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং মধু বসু পরিচালিত ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলীবাবা'। এই ছবি দুটি সে যুগের দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। ঠিক এই সময়ই 'ঠিকাদার' ছবিটিও ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স যথেষ্ট চমক দিয়ে সৃষ্টি করেছিল। ছবিটির পরিচালনায় ছিলেন প্রফুল্ল রায়।

৪.৪.৪ স্বাধীনতা পরবর্তী পালাবদল

দেশ স্বাধীন ও ভাগ হওয়ার অনেক আগেই যাত্রা শুরু করেছিল বাংলা সিনেমা এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের উপর ছিল তার গভীর প্রভাব। এই বাংলার হীরালাল সেনই ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ রূপে স্বীকৃতি পান। কিন্তু খুব ভাল করে শুরুর দিকের চলচ্চিত্র জগতের বিষয় ভাবনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, চলচ্চিত্র নামক শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে মানুষ-সমাজ-রাজনীতির সমকালের যে যোগসাজস রয়েছে বা সেটার যে স্বাভাবিক প্রকাশ মাধ্যম চলচ্চিত্র হতে পারে, এই সত্যিটা তখনকার বাংলা ছবি এবং তখনকার ছবি নির্মাতারা বুঝে উঠতে পারেননি। এটা লক্ষ্যণীয় যে স্বাধীনতার জন্য বাংলা তথা বাঙালির সংগ্রাম, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, কলকাতার রাজপথে মৃত্যু-মিছিল, দেশভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা, ভাতৃঘাতী দাঙ্গা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবতা ধ্বংসকারী ফ্যাসিবাদের উত্থান — একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ও সমাজ জীবন বদলে দেওয়া ঘটনার প্রভাব বা প্রতিফলন সেভাবে বাংলা চলচ্চিত্রে দেখা যায়নি যা পরে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের হাত ধরে বাংলা চলচ্চিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী দশকে এই ভাবনা ক্রমেই মাথাচাড়া দিতে থাকে যে সিনেমা একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম

বা আরও কিছুর জনক হতে পারে। সিনেমা সম্পর্কে এই নতুন ভাবনার ও পথের সূত্রপাত হয় একঝাঁক তরুণের উদ্যোগে। এই বাংলাতেই কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সূচনা হয়। সেই আন্দোলন থেকে উঠে এলেন নতুন বাস্তববাদী ধারার পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, রাজেন তরফদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরেই গঠিত হয় ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। নব্য পরিচালক এবং চলচ্চিত্র অনুরাগীরা বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পান, বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের ধ্রুপদী ছবিগুলির প্রতি মনযোগ যায় অর্থাৎ দেখা শুরু হয়, সেগুলি নিয়ে চর্চায় নিজেদের সমৃদ্ধ করা আর একই সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ভালো সিনেমা নির্মাণের প্রস্তুতি।

পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই বাংলা চলচ্চিত্র-ভাবনা থেকে শুরু করে তার নির্মাণ সম্পর্কিত যাবতীয় প্রথাগত ধ্যানধারণা সবটাই পাল্টাতে থাকে। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি পথের পাঁচালীর নির্মাণভাবনা থেকে শুরু করে তার শিল্পরূপ এবং এই অন্যধারার ছবিটির অভাবনীয় সাফল্য চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ছবির পরিচিতি ঘটায়। তবে শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায় নন, তাঁর সমসাময়িক বাংলা চলচ্চিত্রের অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনও স্বাধীনতার পরে প্রায় একই সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে পা রেখেছিলেন। সমকালীন এই তিনজনের সৃষ্টির উড়ানে চেপেই বাংলার এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্ব চলচ্চিত্রের আসরে গৌরবময় অবস্থান দখল করে।

সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল এর মিলিত অবদানের পাশে উল্লেখযোগ্য আরও কিছু চলচ্চিত্র নির্মাতার নাম। রাজেন তরফদারের ১৯৫৭ থেকে ১৯৮৭ তিন দশকে মাত্র ৭টি ছবি- অন্তরীক্ষ, গঙ্গা, অগ্নিশিখা, জীবনকাহিনী, আকাশছোঁয়া, পালঙ্ক আর নাগপাশ। তার মধ্যে গঙ্গা আর পালঙ্ক বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। বাংলা ছবির এই নতুন অধ্যায়ের সুচনায় তাঁর কথা উঠে আসে মূলত তাঁর বিচিত্র বিষয় নিয়ে ছবি তৈরির জন্য। গঙ্গাকে তিনি দেখেছিলেন এক দার্শনিক কোণ থেকে। 'আকাশছোঁয়া'র কেন্দ্রে ছিল সার্কাস। নায়ক মোটরবাইক স্টান্ট খেলোয়াড়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনি অবলম্বনে করলেন পালঙ্ক। দেশভাগ, বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তুদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং একটি পালঙ্ক ঘিরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ঊর্ধে আসে বাঙালি মূল্যবোধ। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্র রাজেন তরফদার কর্মজীবন শুরু করেন বিজ্ঞাপন জগতে আর সেখান থেকেই থেকেই সিনেমার জগতে আসা, ১৯৫৭-য়। তখন থেকেই সর্বক্ষণের চলচ্চিত্রকার-জীবন শুরু। শুধু পরিচালনাই নয়, অভিনয়েও নিজের ছাপ রেখেছেন মৃণাল সেনের 'আকালের সন্ধানে' ও 'খণ্ডহর', শ্যাম বেনেগালের 'আরোহণ' আর শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'বসুন্ধরা' য়।

বহু সমাদৃত সমান্তরাল সিনেমা-র বাইরে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে আর এক গুণী পরিচালক তপন সিংহ। যিনি খুব ভাল করেই জানতেন সংস্কৃতিমনা বাঙালির রুচি ঠিক কোন ধরনের সিনেমায় এবং গল্পের গুরুত্ব। তিনি সেলুলয়েডে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে তারাশঙ্কর, বনফুল, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প। তাঁর নির্মিত 'অঙ্কুশ, উপহার, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, ঝিন্দের বন্দী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নির্জন সৈকতে, জতুগৃহ, হাটে বাজারে'র মতন ছবিগুলি মোটের উপর সাহিত্য নির্ভর। আবার 'আপনজন, সাগিনা মাহাতো' ইত্যাদি ছবিতে তপন সিংহকে পাওয়া যায় একেবারে অন্যভাবে যেখানে তিনি সময়ের দাবি মেনে রাজনীতি এবং সমাজকে কেবল যে বোঝবার চেষ্টা করছেন তাই নয় সমকালীন নিরিখে তাঁর নিজের কথাও বলেছেন। সময়কে আরও বেশি স্পষ্ট ও সোচ্চার হতে দেখা যায় তাঁর 'আতঙ্ক' ছবিটিতে। ছবির প্রয়োজনে কাহিনি, গান রচনা এবং তার সুরারোপ এমনকি শুটিং এর খুঁটিনাটি কারিগরি প্রকৌশলে তপন সিংহ ছিলেন দক্ষ।

একথা স্বীকার করতেই হয় যে তপন সিংহ স্বাধীনতা-উত্তর মূলধারার সিনেমায় অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র নির্মাতাদের একজন।

আবার তরুণ মজুমদারের মতন জনপ্রিয় পরিচালকের দর্শকের কাছে পৌঁছানোর পথ ছিল সিনেমার সহজ রসায়ন ভালো গল্প ও মন ছোঁয়া গান। এই রসায়নে পলাতক, আলোর পিপাসা, বালিকা বধু, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, ফুলেশ্বরী, সংসার সীমান্তে, গণদেবতা তার উল্লেখযোগ্য কাজ। অন্যদিকে ভালোবাসা ভালোবাসা, দাদার কীর্তি, আলো সাধারণ দর্শকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

পাশাপাশি গত শতকের আশির দশকের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল পরবর্তী প্রজন্মের বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ চলচ্চিত্রকাররাও নান্দনিক দিক দিয়ে যেমন তেমনই সমাজ-সচেতন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও উল্লেখ্য। সত্যজিৎ ঋত্বিক ও মৃণাল পরবর্তী আলোচনায় প্রথমেই আসতে পারেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তাঁর বেশ কিছু ছবির জন্য। দূরত্ব, নিম অন্নপূর্ণা, গৃহযুদ্ধ, তাহাদের কথা, মন্দ মেয়ের উপাখ্যান, চরাচর, লাল দরজা, উত্তরা, স্বপ্নের দিন, কালপুরুষ, আমি ইয়াসিন এবং আমার মধুবালা, শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি, ফেরা ও বাঘ বাহাদুর বলে অন্যধারার ছবির কথা। যেমন নিম অন্নপূর্ণা উপনিবেশ-উত্তর বাংলার সমাজবাস্তবতার তৎকালীন সঙ্কটের ছবি। দারিদ্র্যে দুঃখে লীন মানুষের কাব্য।

গৌতম ঘোষ চলচ্চিত্র জীবন তথ্যচিত্র নির্মাণ দিয়ে শুরু করেও দখল, দেখা, পদ্মা নদীর মাঝি, আবার অরণ্যে, কালবেলা, মনের মানুষ, শূন্য অঙ্ক, শঙ্খচিল প্রভৃতি বাংলা ছবি করেছেন। বিষয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি চরিত্র ও আখ্যান নির্মাণেও তাঁর মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি পরিচালক হিসেবে নির্মাণ করেছেন যৌথ প্রযোজনার ছবি ‘শঙ্খচিল’ (২০১৬)। ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা বাংলা ছবি হয়েছে গৌতম ঘোষের ‘শঙ্খচিল’। দেশ ভাগের পর বর্তমান সময়ের দুটি পরিবার যারা সীমান্তে বাস করছে তাদের জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি ‘শঙ্খচিল’। আর এক পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তীও তথ্যচিত্র দিয়ে শুরু করেছিলেন। এরপর ময়নাতদন্ত, চোখ, দেবশিশু প্রভৃতি বাংলা ছবিতে তিনি স্বকীয়তা রাখার চেষ্টা করেন। সমাজ রাজনীতির কথা তিনিও সরাসরি তার ছবিতে আখ্যানের মাধ্যমেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আর একজন অন্যরকম ব্যতিক্রমী ও প্রভাবশালী পরিচালক অপর্ণা সেন, অভিনয়ে-নির্মাণে বহুমাত্রিকতাই যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৩৬ চৌরঙ্গী লেন থেকে গয়নার বাক্স, গল্প বলে নারীর একান্ত গহীন গোপন সব একাকিত্বের কথা। ৩৬ চৌরঙ্গী লেন এক সঙ্গীহীন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারীর জীবনের শূন্যতার করুণ উপাখ্যান। বাংলা সিনেমায় নারীচরিত্রের সহযোগী হয়ে থেকে যাওয়া ভবিতব্যের উল্টো স্রোতে হাঁটে অপর্ণা সেনের পরমা, পারমিতার একদিন, গয়নার বাক্স। নারীবাদকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেন তিনি যাতে ছোঁয়া লাগে মানবতার। যেমন ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস’ আয়ার যুদ্ধ ও দাঙ্গার চরম মুহূর্তে মানুষের মানবিক আবেদনের জায়গা। বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠীর মানুষের বিপদের মাঝে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের বিচিত্র কর্মকাণ্ড। অপর্ণা সেন, ভারতীয় তথা বাংলা সিনেমাজগতে এক অতি পরিচিত অতীত ও বর্তমান নাম। ভবিষ্যতের পথেও তিনি এক পা বাড়িয়েই রেখেছেন। অভিনয়, চিত্রনাট্য লেখা, চলচ্চিত্র নির্মাণ- পর্দার সকল ধাপেই তিনি সাবলীল ও অনন্য। ১৯৮১ সালে অপর্ণা সেনের প্রথম পরিচালিত সিনেমা ‘থার্টি সিক্স চৌরঙ্গী লেন’ মুক্তি পায়। এর জন্য তিনি ম্যানিলা চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে গোল্ডেন ঈগল পুরস্কার পান।

আর এক ব্যতিক্রমী পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের স্বল্প কর্মজীবনের মাত্র উনিশ বছরের মধ্যেই মেধা এবং প্রতিভার ফসল মোট উনিশটি ছবি। তাঁর প্রত্যেকটি ছবিই স্বতন্ত্র, অনবদ্য এবং স্বকীয় চিন্তার প্রতিফলন। বেশ কিছু ছবিই

জাতীয় পুরস্কার জয় করেছিল। পরবর্তী বাংলা সিনেমার নতুন এক ধারা তৈরি করেছিলেন ঋতুপর্ণ। তাঁর চলচ্চিত্র জীবন শুরু ’’’হীরের আংটি’-র হাত ধরে এবং শেষ হয় ‘চিত্রাঙ্গদায়’-য়। এর মাঝে তৈরি করেছেন উনিশে এপ্রিল, দহন, উৎসব, চোখের বালি, দোসর, রেনকোট, শুভ মহরত, সব চরিত্র কাল্পনিক, নৌকাডুবি সহ এক গুচ্ছ জনপ্রিয় অন্যধারার ছবি। তাঁর গল্প উপস্থাপনের কাব্যিক ধরন তাঁর প্রায় প্রতিটি সিনেমাকেই এক অন্য বিশিষ্টতা দিয়েছিল। আরেকটি প্রেমের গল্প, মেমরিস ইন মার্চ ও চিত্রাঙ্গদা - এই তিনটি ছবিতে অভিনেতা ঋতুপর্ণ ঘোষের অনন্য অভিনয় প্রতিভার সাক্ষী থেকেছেন দর্শকরা। এরপর চলচ্চিত্রে স্বকীয়তার দাবী নিয়ে এসেছেন কৌশিক গাঙ্গুলী, সৃজিত মুখোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল উত্তরকালে চলচ্চিত্রের ভাষা ও চলচ্চিত্র নির্মাণরীতির নান্দনিক সৌকর্যকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে বিশিষ্ট জায়গা দেওয়ার ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অসামান্য বলেই মনে করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এদের অসামান্য অবদান রয়েছে। এদের ছবি দেখতে বাঙালি দর্শক প্রেক্ষাগৃহের টিকিট কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন দিয়েছে, বিনোদিত হয়েছে বলেই প্রযোজকরা বাংলা ছবিতে লগ্নি করতে সাহস পেয়েছেন। সে লগ্নিতে ভর করেই আজ ওই ব্যাবস্থাটা পুরোপুরি বদলে মাল্টিপ্লেক্স চর্চায় পরিণত হয়েছে। একে একে কলকাতার তথা বাংলার অন্য শহর মফস্বলের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রেক্ষাগৃহগুলি যেমন মল বা মাল্টিপ্লেক্সে পরিণত হয়ে পৌঁচেছে চলচ্চিত্র বাণিজ্যের অন্য মাত্রায়।

৪.৪.৫ সারাংশ

আমরা এই এককে যে বিষয়ে আলোচনা করলাম সেই গুলি হলো:

- বাংলা চলচ্চিত্রের শুরুর কথা
- বাংলা চলচ্চিত্রের যাত্রাপথ
- স্বাধীনতা পরবর্তী পালাবদল

৪.৪.৬ অনুশীলনী

১. বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে হিরালাল সেনের অবদান বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. বাংলা চলচ্চিত্র ঋতুপর্ণ ঘোষের ভাবনায় কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা আলোচনা করুন।

৩. বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের যাত্রাপথ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪. বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

- সোনার দাগ গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ।
- বাংলা সিনেমা অরুণ দাশগুপ্ত।

- বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস মুখোপাধ্যায়।
- History - Bengali cinema Kiranmoy Raha.
- Encyclopaedia of Indian cinema.
- Mass Communication in India– Keval J kumar
- গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি, ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য।
- চলচ্চিত্রের অভিধান—ধীমান দাশগুপ্ত।